

# আমার মামার বাড়ির পুজোর স্মৃতিচারণ

- পূর্ণিমা ঘোষ

আশ্বিন এলেই মনে আসে পুজোর কথা। আমাদের টোকিওর পুজোর হৈ চৈ-এর পাশাপাশি মনের পর্দায় ভেসে ওঠে ছেলেবেলার অনেক পুজোর স্মৃতি। ছেলেবেলার সেই স্মৃতির ঝুলিতে জমা ধুলো ঝেড়ে অঞ্জলির জন্যে বেছে নিলাম এ বছর, মামার বাড়ির পুজোর কিছু কথা।

আমার মামার বাড়ি অর্থাৎ হদলনারায়ণপুরের জমিদার বাড়ির পুজো প্রথম শুরু হয়েছিল ইংরাজী ১৭১২ সালে, যখন বিষ্ণুপুরের মহারাজা গোপাল সিংহের পুষ্টপোষকতায় আমার মামার বাড়ির পূর্ব পুরুষগণ জমিদারির পত্তন করেন। তখন তাঁদের পদবি ছিল 'ঘোষ'। আজকে 'ঘোষ' পদবির পরিবর্তে মামারা 'মগোল' পদবি ব্যবহার করেন। এটা আসলে সত্যিকারের পদবি নয়। এটা মল্লার রাজাদের দেওয়া উপাধি। যাইহোক, সময়ের সঙ্গে মামার বাড়িতে অনেক পরিবর্তন এসেছে। সেদিনের মগোল পরিবার তিন ভাগে ভেঙেছে-

বড়োতরফ, মেজোতরফ ও ছোটোতরফ। আমার মামার বাড়ি মূলতঃ বড়োতরফ, যার সদস্য সংখ্যা আজ প্রায় হাজারেরও বেশী। আমি ছেলেবেলায় সেই বড়োতরফের পুজোতেই সামিল হয়েছি বারবার, মা ও ভাইবোনদের সাথে। দেখেছি পুজোর সময় এলেই সেই হাজারেরও বেশী সদস্যদের একত্রিত হতে মগুপে, দুর্গাতিনাশিনী দুর্গার আরাধনায়। দেখেছি কেমন করে সেদিন দুর্গাদালান, গোল দরজা, সাতমহলা জমিদারবাড়ি, টেরাকোটা দামোদর চন্দ্রের মন্দির, ও রাশমন্দির, সবকিছু সেজে ওঠে নূতন সাজে, নূতন রঙে; বড় বড় কাঁচের রঙিন ঝাড় বাতিগুলো টাঙানো হয় কেমন করে দুর্গাদালান আর নাট মন্দিরে; কেমন করে নানারকম ফুল দিয়ে সাজানো হয় পুরো জায়গাটা।



গোল দরজা



রঙিন ঝাড় বাতির সাজ

এত বড়ো দালান বাড়ি স্বল্প সময়ে পরিষ্কার করা ও সাজানো সহজ কাজ নয়। তাই দেখেছি বাইরে থেকেও লোক নিয়োগ করতে। এত খরচের জন্যে অবশ্য কোনো বেগ পেতে দেখিনি কাউকে। কেননা পুজোর সব খরচ আসে দেবত্ব সম্পত্তির আয় থেকে।

মামার বাড়ির পুজো হয় বৈষ্ণব মতে। পুজোর কাজের সাহায্যের জন্য কয়েকজন বৈষ্ণব সম্রদায়ের লোকজনও নিযুক্ত থাকেন।

ষষ্ঠীর নবপত্রিকা আনা হয় বদাই নদী থেকে পুরানো প্রথায়। বড় সাজানো পাক্কিতে করে চারজন দশ বারো বছরের ছেলে নিয়ে আসে নবপত্রিকা নিষ্ঠা ভরে। সঙ্গে থাকে আর একজন ছেলে বড় রঙিন ছাতা হাতে। অন্যদিকে যুবতী মেয়েরা শাঁখ হাতে পূর্ণ কলস নিয়ে অপেক্ষা করে প্রধান দরজায় বরণ করার জন্যে।



ভিয়ান ঘরে পৃথক ভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে।

প্রসঙ্গতঃ একথা বলাই বাহুল্য যে সপ্তমী থেকে দশমী পর্যন্ত প্রতিটি পুজো ও অনুষ্ঠান পালন করা হয় এখানে সেদিনের জমিদার বাড়ির ঐতিহ্য অনুসারে। ধূপের গন্ধে আর বৈদিক মন্ত্রে এক অপূর্ব পরিবেশ সৃষ্টি হয়। পুজোর চার দিন পরিবারের সকল সদস্যই এক সঙ্গে খাওয়া দাওয়া করেন এই দুর্গামগুপে। অষ্টমীতে এখানে পশুবলি নিষিদ্ধ। পুজোর ক'দিন সব খাবারই নিরামিষ। দশমীর মাছ বলির পর আমিষ খাবার প্রথা আছে। পুজোর ফলমূল বাইরে থেকে এলেও বাজারের দোকান থেকে কেনা মিষ্টি বা ঐ ধরনের খাবারে মা দুর্গার পুজো এখানে হয় না। পুজোর মিষ্টি তৈরি করা হয়

পোশাক পরিচ্ছদে বিশেষ কোনো বাধা নিষেধ না থাকলেও জুতো পরার নিয়ম নেই পুজোর সময়। আর নেই ঢাক বাজানোর নিয়ম। তাই এখানে পুজোয় পাঁচ-ছটি দল ঢোল, সানাই, বাঁশি ইত্যাদি বাজনা বাজায় দুর্গা মগুপে। দামোদর চন্দ্রের মন্দিরে বাজে খোল করতাল। সন্ধ্যারতির সময় ঢোলের বাজনা মিশে যায় খোল করতালের বাজনার সঙ্গে। আর তা যখন এক হয়ে চার দেওয়ালে প্রতিধ্বনিত হয় তখন এক অদ্ভুত অনুভূতি জাগায় সবার মনে। মন ভরে ওঠে পবিত্রতায়।



রাশ মন্দির

দশমীতে সন্ধ্যায় দুর্গা প্রতিমা নিয়ে আসা হয় গোল দরজার সামনে মেয়েদের সিঁদুর খেলার পর। অনেক আতস বাজি ও পটকা ফাটানো হয়। ফানুস ওড়ানো হয়। তারপর প্রতিমা নিয়ে যাওয়া হয় মিছিল করে বদাই নদীতে বিসর্জন দেওয়ার জন্যে। বিসর্জনের পর, সে রাতের মধ্যে আবার প্রতিমার কাঠামো নিয়ে আসা হয় দুর্গা দালানে পুরানো চিরাচরিত নিয়ম মেনে।



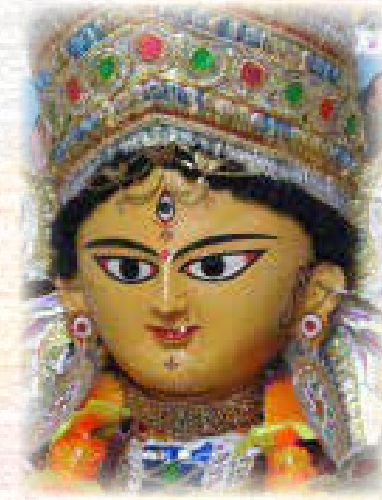
মায়ের পূজা

সেই চিরাচরিত নিয়মেই বোধ হয় দুর্গা পুজোকে কেন্দ্র করে মণ্ডপে বসে যাত্রা পালার আসর পুজোর দিনগুলিতে, যেখানে বিভিন্ন ভূমিকায় অংশ নেন পরিবারের সদস্যরা। চলে গল্প। পুজো মণ্ডপ হয়ে ওঠে সবার কাছে, বিশেষ করে মণ্ডল পরিবারের কাছে এক মিলনক্ষেত্র। বিজয়া দশমী হয়ে ওঠে এখানে অমূর্ত ভালোবাসার এক মূর্ত প্রকাশ; সবার মিলনে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের বিচ্ছুরণে অমৃতময়।

তাই মামার বাড়ির পুজো বিদেশেও আমার মনে অনুরণন জাগায়। আমি কিছুই ভুলি নাই মামার বাড়ির পুজোর মজা। ভুলি নাই আমার দাদু দিদা, মামা-মামিমাদের ও আত্মীয় স্বজনদের আদর। ভুলি নাই মামার বাড়ির ভাই বোনদের সাথে মা দুর্গার কাছে অঞ্জলি দেওয়ার উত্তেজনা ও আনন্দ। আমাদের টোকিওর এক দিনের পুজোয়, আমি তাই সেই অমৃতময় আনন্দকে খুঁজি; অনুভব করার চেষ্টা করি।



দামোদরচন্দ্রের মন্দির



স্বর্ষভূতেষু দুর্গতিনাশিনী মা দুর্গাকে প্রণাম জানাই।।

#### Further Reading:

1. 'হদলনারায়নপুর -মণ্ডল- বংশের ইতিহাস' by শ্রী গোকুল চন্দ্র মণ্ডল, Publisher: রামপুর বড়মণ্ডল দেবত্তর এস্টেট, হদলনারায়নপুর, বাকুড়া, পশ্চিম বাংলা, ভারতবর্ষ
2. URL: <https://amitabhagupta.wordpress.com/2012/09/24/brick-temple-towns-of-bankura-part-ii-hadal-narayanpur/>
3. URL: [http://www.telegraphindia.com/1101031/jsp/calcutta/story\\_13119724.jsp](http://www.telegraphindia.com/1101031/jsp/calcutta/story_13119724.jsp)
4. URL: <http://drasiskchatterji.hubpages.com/hub/Hadal-Narayanpur-the-little-known-heaven-of-terracotta-art>
5. URL: <https://rangandatta.wordpress.com/tag/hadal-narayanpur/>

## - শুভা কোকুবো চক্রবর্তী



ই আগস্ট ও ৯ই আগস্ট, ২০১৫... যথাক্রমে হিরোশিমা ও নাগাসাকির পরমাণু বিস্ফোরণের ৭০বছর পূর্ণ হোল।

৬ তারিখ ভোরবেলায় সাইরেন বাজে ওয়ার্ড অফিসের মাইকে। হাজার হাজার মানুষ জড় হয় কাঠফাটা রোদ মাথায় নিয়ে। এই দুই শহরেই এখন আকাশছোঁয়া বড় বড় অফিস, ম্যানসন, বাইপাস, হাইওয়ে ২/৩ তলা। সেই ৭০বছর আগের কোন চিহ্নই আজ আর নেই।

হিরোশিমাতে তৈরী হয়েছে পীস্পার্ক। ১৯৪৫এর ৬ই আগস্ট সকাল ৮:১৫ তে বিস্ফোরণের পর চারদিক যখন ছিন্নভিন্ন, সেই সময় Hiroshima Prefectural Industrial Promotion Hallটি যে বাড়িতে অবস্থিত ছিল সেই দালানের দেয়াল ইত্যাদি ধ্বংসে পড়লেও লোহার কাঠামোটা অটুট ছিল। এটাকেই স্মারকচিহ্ন হিসেবে রাখা আছে। Atom Bomb Dome। প্রতিবছর ৮ই আগস্ট



সবাই মিলিত হয় এখানে। সকাল ঠিক ৮:১৫ ...মাইকে জোড়ালো আওয়াজ “মোজ” ...বোম পরার সেই নিমেষটাকেই এরা বেছে নিয়েছে নীরবতা পালনের জন্য। প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ দিয়ে শুরু হয় অনুষ্ঠান। স্থানীয় স্কুলের বাচ্চারা হেইওয়া(শান্তি)র গান গায়, পাঠ করে।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক, কাতো-সান, প্রতিবছর এইদিনে ফুলের তোড়া নিয়ে তাম্বারা এলিমেন্টারি স্কুলে আসেন। ১৭বছর বয়স তখন। চারদিকে আঙুন, ধোঁয়া, শব্দ...দৌড়তে থাকেন কলেজ থেকে নিজের বাড়ির দিকে। সেই পথেই এই তাম্বারা এলিমেন্টারি স্কুল। স্কুলবাড়ি থেকে বাচ্চাদের আর্তনাদ শুনে ঢুকে পড়েন ধ্বংসস্তূপের মধ্যে। বাচ্চাগুলোর চিৎকার “বাঁচাও বাঁচাও”...কিন্তু সব বাচ্চা চাপা পড়ে আছে ভেঙে পড়া দেয়ালের নীচে। কয়েকজন হাত নাড়ে চোখে জল নিয়ে যন্ত্রণায় কাঁরাতে কাঁরাতে। ১৭বছরের যুবক হাত ধরে টানার চেষ্টা করে। কোন লাভ হয়না। পিছন দিক থেকে আঙুনের শিখা লকলক করে গ্রাস করতে থাকে এক এক করে, তারমধ্যেই বাইরের কল খুলে কয়েকজনের মুখে একটু জল দেয় আর বলে “মন শক্ত রাখো”। আজ এই ৭০বছর পরেও স্কুলচত্বরে ফুলের তোড়া রেখে হাত জোড় করে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠেন ৮৭বছরের বৃদ্ধ। হিরোশিমাতে মৃতের সংখ্যা ছিল ২৩৭০০০।

৯ই আগস্ট নাগাসাকিতে “মোজ”র সময় বেলা ১১:০২। এখানে মৃতের সংখ্যা ছিল ১৩৫০০০। এখানেও পীস্পার্ক আছে। পার্কের মধ্যে প্রায় ১০মিটার উঁচু এক মূর্তি রাখা, Peace Statue। মূর্তির ডানহাত আকাশের দিকে তর্জনী দেখায়। নিউক্লিয়ার শক্তিকে দেখায় ওপরে হাত রেখে। প্রসারিত বাঁহাত শান্তিবর্তী বহন করে। সুন্দর মুখে রয়েছে ঐশ্বরিক সৌন্দর্য্য। আধবোজা চোখে প্রার্থনা জানায় মৃত আত্মার শান্তির জন্য।

বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী এদেশ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরাজয়ের পর অহিংসাকে মূলমন্ত্র করে এগিয়ে যেতে চেষ্টা করে, এগোয়ও আর তাই ৭০বছর আগের কোন চিহ্ন দেখা যায়না এখানে। তবে এদেশের বিভিন্ন অংশে বিরাট বিরাট জায়গা জুড়ে যুদ্ধে প্রাণহারানো সৈনিকের কবর রয়েছে। চিহ্ন বলতে ওটাই। জুনের দাদু (ঠাকুরদা), বড় মামা যুদ্ধে গিয়ে আর ফেরেননি। তাঁদের কবরও আছে সেখানে।

NO MORE SENSOU (WAR) স্কুলেও পড়ানো হয়। হেইওয়া(শান্তি)র কথা শেখানো হয়। এই প্রজন্মের বাচ্চাদের কাছে হিরোশিমা নাগাসাকি তো ইতিহাস।

যুদ্ধই কি আর শুধু সর্বনাশ ডেকে আনে? ১৯৭৯তে আমেরিকার পেন্সিলভেনিয়ার THREE MILE ISLAND পাওয়ার প্ল্যান্ট ডিসাস্টার, ১৯৮৬তে রাশিয়ার CHERNOBYL পাওয়ার প্ল্যান্ট ডিসাস্টার, আর ২০১১তে জাপানের ফুকুশিমা পাওয়ার প্ল্যান্ট ডিসাস্টার। যুদ্ধ নেই,



হিংসা নেই...কেবল ভয়ানক ভূমিকম্প আর ৭সুনামি ১১ই মার্চের বসন্তের দুপুরে সব তছনছ করে দিল। হাজার হাজার মানুষ এখনও গৃহহারা। ফুকুশিমা পাওয়ার প্ল্যান্টের আশেপাশে মাইলের পর মাইল শুধু রেসিডেন্ট এরিয়া। লোকজনহীন ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, বাজারহাট সব সেদিনের মত করেই থেমে আছে।

জাতের নামে নোংরামি, দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচার, হানাহানি, মারামারি...আজও চলছে সারা পৃথিবীজুড়ে। “সেই ট্র্যাডিশন আজও চলছে”...

তবু কি আমরা থেমে থাকি? আবার আমরা স্বপ্ন দেখি, সুস্থভাবে বাঁচার চেষ্টা করি, শান্তি খুঁজি, বারবার। ■

আমরা যারা সত্তরের কোঠা ছুঁই ছুঁই করছি তারা আকাশবাণীর অনুষ্ঠান পরিচয়গ্ৰাপক ধ্বনি বা সিগনেচার টিউনের বেহালার টান শুনলে বড্ড স্মৃতিমেদুর হয়ে পড়ি। যাদের বয়েস এখনও পঞ্চাশের কোঠায় তাদেরও মনে হয় রেডিও যন্ত্রটির সঙ্গে খানিকটা হলেও পরিচয় আছে।

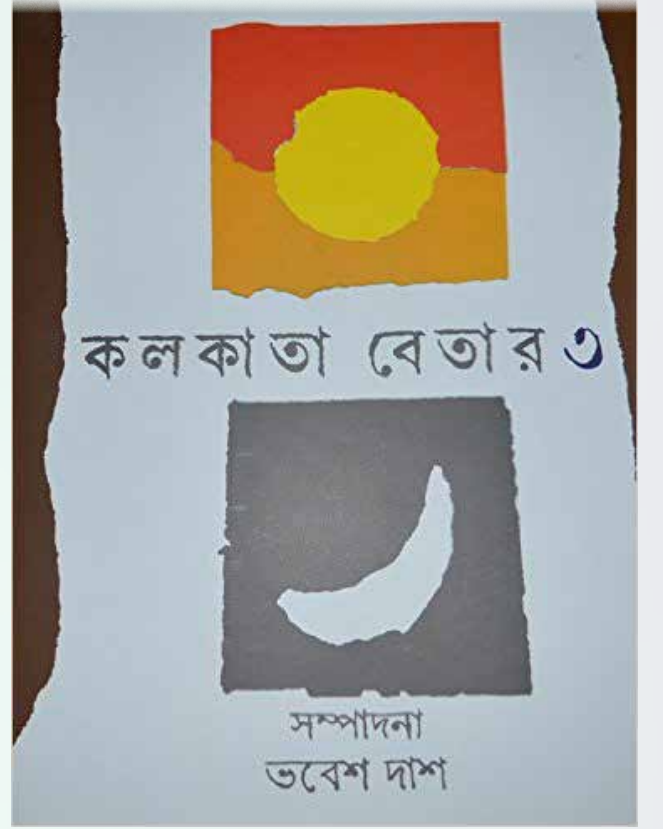
দূরের কোন বাড়ীর রেডিও থেকে এই সুরধ্বনি আর প্রথম ট্রামের ঘণ্টা ভোরের আলো ফোটার আগে আমাদের দিন শুরুর একটা আভাস দিয়ে জাগিয়ে তুলত। এর পরই বন্দে মাতরমের সুর শেষে ঘোষকের গম্ভীর গলায় 'চারশো সাতচল্লিশ দশমিক আট মিটার ব্যান্ডে' কোলকাতা ক-এর প্রথম অধিবেশনের শুরুর ঘোষণা। মনে পড়ে আমাদের চোরবাগানের বাড়ীর দোতলার ড্রইংরুমের একধারে মারফি কোম্পানির একটা রেডিও শোভা পেত। রেডিওটার বাঁ দিকের ওপরের কোণায় একটা বাচ্চার ঠোঁটে আঙ্গুল ছোঁয়ানো ছবি। সেসময় ভালভ লাগানো রেডিওতে সুইচ অন করার পরে আওয়াজ আসতে খানিকটা সময় নিত। কিছুদিন পর বাড়ীতে জার্মান গ্যারাড কোম্পানির একটা রেডিওগ্রাম এল যার সঙ্গে ছিল একটা রেকর্ড চেঞ্জারও। জাপানীরা তখনও রেডিও শিল্পে এতটা দাপাদাপি শুরু করেনি। যতদূর মনে পড়ে সেটা ছিল পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি।

পঞ্চাশ-ষাট কেন আশির দশকের শুরু পর্যন্ত আমাদের জীবনে রেডিওর একটা মস্তবড় ভূমিকা ছিল। তখনও পর্যন্ত সাধারণ বাঙালি সমাজে ডিস্ক রেকর্ডে গান শোনা আর সপ্তাহান্তে সিনেমা হলে গিয়ে পাঁচ-সিকের টিকিটে একটা সিনেমা দেখার মধ্যেই বিনোদন আর সাংস্কৃতিক চর্চা সীমাবদ্ধ ছিল।

ক'দিন হল ভারত সরকারের পূর্বাঞ্চলীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র থেকে প্রকাশ করা কোলকাতা বেতার কেন্দ্রের প্রথম পঞ্চাশ (১৯২৭-৭৭) বছরের ইতিহাস নিয়ে লেখা একটা বই হাতে এসে পড়ল। বইটা প্রকাশ হয়েছিল দু'হাজার এগারো সালে। সম্পাদনা করেছেন আকাশবাণীর অবসরপ্রাপ্ত ভবেশ দাশ এবং প্রভাত কুমার দাস। হিরণ মিত্র সুন্দর প্রচ্ছদ এঁকেছেন আর প্রখ্যাত কবি-সাহিত্যিক শঙ্খ ঘোষ মশায়ের নজরদারিতে এই ছ'শ পাতার বইটি রূপ পেয়েছে। 'কোলকাতা বেতার' নামকরণটিও ওনারই করা।

অনেক নামী দামী মানুষদের লেখা বিভিন্ন প্রবন্ধের মধ্যে বেশিরভাগই স্মৃতিকথার মেজাজে লেখা আর কিছু গবেষণা ও তথ্যসমৃদ্ধ লেখাও এতে স্থান করে নিয়েছে। এর সঙ্গে উপরি পাওনা হল কিছু দুস্তাপ্য ছবি যার সিংহভাগই হল পরিমল গোস্বামীর তোলা। কিছু কিছু লেখা অবশ্য সাতাত্তর সাল ছাপিয়ে গেছে। তাতে পাঠকের বিন্দুমাত্র রসভঙ্গ হয়েছিল বলে আমার মনে হয়না।

অগ্রজ ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং করপোরেশানের হাত ধরে ১৯২৭ সালের পঁচিশে এপ্রিল কলকাতায় ইন্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং করপোরেশানের যাত্রা শুরু। বাণিজ্যিক কারণে কিছু ব্যবসায়ী ব্রিটেনে ও ভারতে রেডিও সম্প্রচারের ব্যবসায় অর্থলাভ করেন। কিছুদিনের মধ্যেই দুটি সংস্থার কর্মকর্তারা নিয়মিত লোকসান আর অর্থাভাবের ধাক্কায় সংস্থা দুটিকে নীলামে তোলার সিদ্ধান্ত নেন। ঠিক সেই সময় বার্লিন থেকে হিন্দুস্থানি ভাষায় খবর প্রচার শুরু হয় যা ভারতের অনেক জায়গায় বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে। ভারতের শাসনকর্তারা সম্যক উপলব্ধি করলেন যে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রচার ব্যবস্থা না থাকলে সুষ্ঠু ভাবে রাজত্ব চালানো সম্ভব নয় কারণ টরে-টরকার যুগ তখন শেষের দিকে। শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার সমস্ত লগ্নিকারীর টাকা মিটিয়ে প্রথমে বিবিসি আর তার প্রায় নব্বছর পরে কলকাতায় ১৯৩৫ সালে অল ইন্ডিয়া রেডিও চালু করেন। বিবিসির আদলে



নতুন সংস্থা তৈরির কোটা থাকলেও ভারতে তখন প্রবল ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন চলতে থাকায় এর পরিচালনা ব্যবস্থার নীল নক্সা আর দিনের আলো দেখতে পেল না।

ইতিমধ্যে বিবিসি থেকে পাঠানো প্রথম স্টেশন ডিরেক্টর স্টেপলটন প্রথমেই অল ইন্ডিয়া রেডিওর অনুষ্ঠান সূচিতে ব্যাপক পরিবর্তন আনেন। শুরু হয় সঙ্গীত, নাটক আর অন্যান্য অনুষ্ঠান আর তার ফাঁকে ফাঁকে সংবাদ প্রচারের ব্যবস্থা। সাধারণ মানুষের মনে তখন এই রেডিওর ওপর বিশ্বাস অনেকাংশেই বেড়ে গেল। ঘরে ঘরে রেডিও কেনার ধুম পড়ে গেল। ওদিকে রেডিও লাইসেন্স থেকে সরকারেরও কিছু আয়ের ব্যবস্থা হল। এক নম্বর গারস্টিন প্লেসের একটা দোতলা ভাড়া বাড়িতে শুরু হল আকাশবাণীর যাত্রা। বাড়ীটা ছিল সেন্ট জর্জ গির্জার লাগোয়া, যেখানে জোব চারনক থেকে শুরু করে অনেক অন্যান্য সাহেবদের সমাধি আছে। যার জন্য অনেকে ধারণা পোষণ করত যে বাড়ীটা একটা ভুতের আড্ডাখানা। এটির প্রবেশ পথ হল ব্যাল্কশাল স্ট্রীটের দিক থেকে।

এই সময় রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ভারতের সাংস্কৃতিক জগতের মধ্যমণি। রেডিওতে ওনার গানের বিকৃতি ঘটান হয় বলে প্রথমে উনি কিছুতেই রেডিওর কোন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে রাজী হননি। রবীন্দ্রনাথ ১৯৪০ সালের ১৯শে জানুয়ারী একটা চিঠি লিখে রেডিওতে হারমোনিয়াম যন্ত্রের ব্যবহার সম্পূর্ণ বন্ধ করতে বলেন এবং কর্তৃপক্ষ তাতে রাজী হয়ে ওই বছর পয়লা মার্চ থেকে ভারতের সমস্ত রেডিও স্টেশনে হারমোনিয়াম যন্ত্রের ব্যবহার বন্ধ করে দেন যা আবার ফিরে এসেছিল ৯ই জুলাই, ১৯৭৫ সালে। এরপরে কবি রেডিওতে নিজের কবিতা আবৃত্তি করতে রাজী হন। প্রথমে ঠিক ছিল শান্তিনিকেতন থেকে টেলিফোন মারফৎ সরাসরি প্রচার হবে। হঠাৎ উনি মত পরিবর্তন করে কালিম্পং চলে গেলে সেখান থেকে আবার নতুন লাইন লাগিয়ে গৌরীপুর লজ থেকে ওনার 'জন্মদিন' কবিতার আবৃত্তি সরাসরি সম্প্রচার হয়। পরে উনি গারস্টিন প্লেসের বাড়িতে

এসে কয়েকটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। ওনার কয়েকটি নাটক রেডিওতে অভিনীত হয়েছিল। কর্তৃপক্ষ ওনার কাছে গিয়ে ওনার আবৃত্তি রেকর্ড করেও কয়েকবার সম্প্রচার করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ওই ছোট্ট রেকর্ডিং যন্ত্রটির রসিকতা করে নাম রেখেছিলেন ‘ক্ষুদে শয়তান’। ১৯৩৯ সালের মাঝামাঝি ব্রিটিশ রাজদম্পতি কানাডা সফরকালে কানাডা ব্রডকাস্টিং করপোরেশান কোলকাতা থেকে কবির একটি আবৃত্তি ও তার ইংরাজি অনুবাদ সরাসরি সম্প্রচার করেছিলেন। কবিতাটির সারমর্ম ছিল বিশ্বযুদ্ধে কানাডার কি ভূমিকা পালন করা উচিত সেই বিষয়ে। কোলকাতা থেকে সেই গালার চাকতিটি জাহাজে করে সাত সমুদ্র পেরিয়েছিল।

১৯৪১ সালের সাতই আগস্ট রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের আগে শেষ কয়েকদিন ওনার স্বাস্থ্যের বুলেটিন নিয়মিত প্রচারিত হত। জোড়াসাঁকো থেকে নিমতলা মহাশাশান পর্যন্ত ওনার শেষ যাত্রার ধারাবিবরণী করেছিলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র যা সেইসময় আপামর বাঙ্গালী ঘরে বসে শুনেছিল। সেদিন সন্ধ্যায় কাজী নজরুল ‘কবিহারা’ কবিতাটি পাঠ করেন। এর পরে নজরুলের রচনা ‘ঘুমাইতে দাও শান্ত কবিরে’ গানটি রেডিওতে গেয়েছিলেন ইলা ঘোষ, চিত্ত রায় প্রমুখ।

এর পরে রয়েছে নজরুলকে নিয়ে চারটে বড়বড় লেখা। একটা নতুন তথ্য পেলাম যা আগে শুনিনি। রেডিওতে ‘দেবীস্তুতি’ নামে একটা অনুষ্ঠান প্রচার হয়েছিল যা হিন্দুর মহাদেবী আদ্যাশক্তির বিভিন্ন কালের বিভিন্ন রূপের মহনীয় বিকাশের বর্ণনা। এটির দশখানি গান আর তার সুরারোপ করেছিলেন স্বয়ং নজরুল। এই অনুষ্ঠানটির ওপর নজরুল একটি বক্তৃতা করেছিলেন সে বছর আঠাশে এপ্রিল। নজরুল গারস্টিন প্লেসের ঐ বাড়ির একতলার একটা ঘরে নিয়মিত গানের ক্লাশ নিতেন। ওনার উল্লেখযোগ্য একজন ছাত্রী হলেন রানু সোম যিনি পরে প্রতিভা বসু নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন।

তখনকার একটা বেতার জগতের থেকে কবি শঙ্খ ঘোষের একটা প্রবন্ধ “রেডিওর সঙ্গে সম্পর্ক” থেকে তৎকালীন যুব সম্প্রদায়ের সঙ্গে রেডিওর সম্পর্ক নিয়ে অনেক তথ্য জানা যায়। অলোকরঞ্জনের সঙ্গে ওনার আবৃত্তি করার একটা ছবি উপরি পাওনা।

সে সময় রেডিও চত্তর দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন হীরেন বসু, কমল দাশগুপ্ত, রাইচাঁদ বড়াল, হিমাংশু দত্ত, গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী, কানন দেবী, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, অমিয়া ঠাকুর, সুবিনয় রায়, শান্তিদেব ঘোষ, যামিনী গঙ্গোপাধ্যায়, চিন্ময় লাহিড়ী, মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, শচীন দেব বর্মণ, কে এল সাইগল, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, সুধীরলাল চক্রবর্তী, জগন্ময় মিত্র এবং আরও সব দিকপালরা।

পরিমল গোস্বামীর লেখা ‘স্মৃতিচিত্রণ’ সুন্দর একটা তথ্য সমৃদ্ধ প্রবন্ধ থেকে অনেক কিছু জানা যায়। ১৯৪১ সালের বাইশে ফেব্রুয়ারী ওনাকে ডেকে পাঠিয়ে স্টেশন ডিরেক্টর একটা অদ্ভুত প্রস্তাব দিয়েছিলেন, পনেরো জন লেখকের আলাদা আলাদা লেখা পনেরোটি অধ্যায় নিয়ে একটা ধারাবাহিক উপন্যাস পাঠের অনুষ্ঠান সম্প্রচার। পরিমল তৎক্ষণাৎ এটির নামকরণ করেছিলেন ‘পঞ্চদশী’। অধ্যায় পরম্পরা হিসেবে নামগুলি হল হেমেন্দ্র কুমার রায়, সরোজ কুমার রায়চৌধুরী, কেশব চন্দ্র গুপ্ত, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, প্রবোধ কুমার সান্যাল, পরিমল গোস্বামী, প্রেমাক্ষর আতর্থা, নরেন্দ্র দেব, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, তারাসঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সবশেষে নরেশ চন্দ্র সেনগুপ্ত। পরিমল নিজের অধ্যায়টি পড়েছিলেন ২৩শে মে, ১৯৪১ তারিখে। হেমেন্দ্র কুমার নিজের অধ্যায়টি আগেভাগে নিয়ে নিয়েছিলেন বলে লেখক মহলে বেশ হাসি-মস্করা হয়েছিল। উনি লিখেছেন যে বরাবরের মত আমি নিজে ছিলাম মধ্যমণি। এরপর ওনারা বৈকুণ্ঠের খাতা রেডিওতে শ্রুতি নাটক করেছিলেন। অভিনেতাদের একটা গ্রুপফটোতে রয়েছে, মনোজ বসু, সজনীকান্ত দাস, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথ নাথ বিশী, বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র, ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং উনি নিজে।

এই সময় বেতার জগত আত্মপ্রকাশ করলে এটি একরকম সাহিত্য পত্রিকার রূপ পায়। এর প্রথম সম্পাদক ছিলেন প্রেমাক্ষর আতর্থা। বিভিন্ন বেতার অনুষ্ঠানের বিবরণ ছাড়াও এতে থাকত বিভিন্ন স্বাদের লেখা আর বিভিন্ন শিল্পীদের ছবি। একবার ডিরেক্টর গিরীশ ঘোষের ওপর প্রচন্দ কাহিনী করতে চাইলে পরিমল বাবুর ওপর ভার পড়ে ছবি জোগাড় করার। উনি সময়মত ছবি দিলেও দেখা গেল প্রচন্দে ছবিটি ছাপা হয়নি। অফিসে খোঁজ নিতে জানা গেল যে অশ্লীলতার জন্য ডিরেক্টর ছবিটি অনুমোদন করেন নি। ছবিটি ছিল গিরীশ পার্কে ওনার খালি গায়ের মূর্তিটির।

ততদিনে বেতার শিল্পে অনেক নতুন নক্ষত্রের সমাবেশ হয়েছে। হেমন্ত, মান্না, মানবেন্দ্র, শ্যামল, সতীনাথ, তরুণ, ধনঞ্জয়, পান্নালাল, সনৎ সিংহ, নির্মলেন্দু, দ্বিজেন, সুবীর সেন, সন্ধ্যা, উৎপলা, সুপ্রীতি, আলপনা, নির্মলা মিশ্র, ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, সুচিত্রা, কণিকা ও আরও অনেকে। (জর্জ বিশ্বাস বিশ্বভারতীর অনুমোদন তখনও পাননি।)

সংবাদ পাঠও ছিল শ্রোতাদের কাছে একটা বিশেষ আকর্ষণ। প্রথম দিকে কলকাতায় বাংলা আর বোম্বেতে হিন্দুস্থানী ভাষায় খবর পাড়া হত। পরে মাদ্রাজ সহ সব জায়গায় হিন্দি, ইংরিজি আর স্থানীয় ভাষায় সংবাদ পাঠ চালু হয়। এই প্রসঙ্গে বইতে একটা মজার ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। বিবিসি থেকে একবার মেমসাহেবকে কলকাতায় পাঠানো হয় ইংরিজি সংবাদ পাঠের তালিম দিতে। কয়েকবার মহড়া দেবার পর উনি কাঁচের ঘরে মাইকের সামনে বসলেন সাম্বাকালীন সংবাদ প্রচারের সময়। স্থানীয় সংবাদ পাঠকেরা সবাই ঘরের বাইরে উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। “দিস ইজ অল ইন্ডিয়া রেডিও, হিয়ার ইজ দ্য নিউজ ইন ইংলিশ.....” উচ্চারণ করার পরই ফিচিৎ ফিচিৎ আওয়াজ। সবাই উন্মুখ হয়ে কাঁচের ঘরের বাইরে থেকে দেখে মেম সাহেব এক নাগাড়ে হেঁচে চলেছেন। পরে আবিষ্কার করা গেল তার ঠিক আগেই ঐ টেবিলে বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র একটা অনুষ্ঠানের সময় তাঁর নস্যি মাখা রুমালটি রেখে ছিলেন। তখনকার সময় বেশিরভাগ সংবাদ পাঠক ঘোষক থেকে উন্নীত হতেন। নীলিমা সান্যাল, সারোজিত (সুরজিত বাবু ওই ভাবে নিজের নাম বলতেন) সেন, দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়দের নাম প্রত্যেকের স্মৃতিতে এখনও উজ্জ্বল। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় কর্মজীবন শুরু করেন আকাশবাণীর ঘোষক হিসেবে বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের তত্ত্বাবধানে এটা অনেকেই জানেন না। অপূর সংসারে অভিনয়ের জন্য কর্তৃপক্ষ ওনাকে একমাসের ছুটি মঞ্জুর না করায় উনি চাকরিতে ইস্তফা দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। কি অসাধারণ সিদ্ধান্ত।

এরপরে রয়েছে অল ইন্ডিয়া রেডিওতে ইংরিজি অনুষ্ঠানের ওপর বুলবুল সরকারের একটা অসাধারণ তথ্যসমৃদ্ধ লেখা। ওনার পরিচালনায় কলিং অল চিল্ড্রেন অথবা বরুণ হালদারের মিউজিকাল ব্যান্ডবন্ধ এখনও আমাদের স্মৃতিমেদুর করে দেয়। বেঠফেনের জন্ম বার্ষিকীতে উনি তিনটে একঘণ্টা করে ইন্টারভিউ রেকর্ড করেছিলেন, সত্যজিৎ, সলিল চৌধুরী এবং কবি বিষু দেব।

বাঙ্গালীদের মধ্যে এমন কাউকে পাওয়া মুশকিল যারা রেডিওতে মহালয়ার দিন সকালে মহিষাসুরমর্দিনীর অনুষ্ঠান শোনে। বাণী কুমার, পঙ্কজ মল্লিক আর বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র এই কারণে সব বাঙ্গালীর অন্তরে এখনও বাস করেন। প্রথম দিকে সরাসরি প্রচারের জন্য সমস্ত শিল্পীদের গারস্টিন প্লেসের স্টুডিওতে অনুষ্ঠানের আগের দিন রাতে আসতে হত। পরের দিকে রেকর্ড করা অনুষ্ঠান প্রচার করা হত। এই সময়কার অনেক লেখা আর ছবি বইটিকে যথেষ্ট সমৃদ্ধ করেছে। ১৯৭৬ সালে এস কে গাঙ্গুলি যখন কেন্দ্র-অধিকর্তা ছিলেন সে সময় আকাশবাণী মহালয়াতে একটা নতুন পরীক্ষা করে। বীরেন্দ্রকৃষ্ণকে পালটে উত্তমকুমার আর বেশীরভাগ শিল্পীর বদলে বয়ে থেকে লতা, আশা, মান্না ইত্যাদিদের নিয়ে একটা নতুন ঢঙে মহালয়ার অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হয়। পরীক্ষাটি একেবারে মাঠে মারা যায় আর আকাশবাণীকে এর জন্য সমালোচনা আর গালাগালি শুনতে হয়েছিল। ব্যাপারটা এতদূর এগোয় যে বিভিন্ন সংবাদপত্র পর্যন্ত এই নিয়ে সমালোচনায় মুখর হয়েছিল আর কর্তৃপক্ষকে ক্ষমা চাইতে একরকম বাধ্য করা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত উত্তমকুমারের একটা লাইন রেকর্ড করে সম্প্রচার হওয়ার পরে জনতার রাগ

খানিকটা হলেও স্তিমিত হয়েছিল। উত্তম বলেছিলেন, 'ঠাকুরঘরকে রেনোভেট করে ড্রইং রুম তৈরীর প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে ভুল ছিল'। মনে রাখতে হবে সেইসময় কিন্তু দেশে জরুরী অবস্থা চালু ছিল। পরের বছর রবীন্দ্র সদনে প্রথম বামফ্রন্টের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বাবুর হাত দিয়ে আকাশবাণীর পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে বিভিন্ন কলাকুশলীকে স্মরণিকা আর মানপত্র দেওয়া হয়েছিল। পঞ্চজ মল্লিক চোখের জলে মঞ্চে উঠে নিজেকে সামলাতে পারছিলেন না। ঠিক তার আগের বছর ওনাকে সঙ্গীত শিক্ষার আসর এবং মহালয়ার অনুষ্ঠান থেকে বিদায় করা হয়েছিল। মঞ্চে উপবিষ্ট তৎকালীন কেন্দ্রীয় বেতার মন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদবানী ব্যাপারটা অনুধাবন করে মাইকটা টেনে নিয়ে ঘোষণা করেন যে সেই বছর থেকে মহালয়ার অনুষ্ঠান আগের মত সম্প্রচার করা হবে। এই ঘোষণার পরে রবীন্দ্র সদনের পুরো আবহাওয়া একেবারে পাল্টে যায়। সেই থেকে আজ পর্যন্ত মহালয়ার পুরনো রেকর্ড করা অনুষ্ঠান সম্প্রচার হয়ে আসছে।

কলকাতা বেতারের আরেকটা খুব জনপ্রিয় অনুষ্ঠান ছিল রেডিও নাটক। অহীন চৌধুরী, শিশির ভাদুড়ি, শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র, উৎপল দত্ত, অজিতেশ, মনোজ মিত্র ছাড়াও প্রায় সমস্ত মঞ্চ সফল অভিনেতা বেতার নাটকে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ছবির দুনিয়ার উত্তম কুমার, সৌমিত্র, অনুপ, শুভেন্দু এবং অন্যান্য অনেক সিনেমা জগতের নায়ক-নায়িকারা বেতার নাটকে অংশগ্রহণ করেছিলেন। শুল্লা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের প্রযোজনায় প্রচুর নামকরা উপন্যাসের নাট্যরূপ আকাশবাণী থেকে সম্প্রচার হয়েছিল।

কোলকাতা বেতারের আরো অনেক জনপ্রিয় অনুষ্ঠানের মধ্যে নজর কাড়ে সাক্ষাৎকার, বিজ্ঞান প্রসঙ্গে, ছোটদের অনুষ্ঠান, মহিলা মহল, অনুরোধের আসর, ছায়াছবির গান, খেলার ধারাবিবরণী ইত্যাদি। তৃপ্তি মিত্রের নেওয়া রবিশঙ্করের বা শম্ভু মিত্রের নেওয়া উদয়শঙ্করের আলাপচারিতা সরাসরি সম্প্রচার করা হয়েছিল। এছাড়া উত্তমকুমারের সঙ্গে আলাপচারিতা করেছিলেন সংবাদ বিচিত্রা খ্যাত উপেন তরফদার। বিজ্ঞান প্রসঙ্গে অনুষ্ঠানে মাইক ধরেছিলেন মেঘনাদ সাহা বা সতেন বোসের মত পৃথিবী বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা। গল্পদাদুর আসর বা বেলা দে পরিচালিত মহিলা মহল সাধারণ বাঙ্গালীর খুব প্রিয় অনুষ্ঠান ছিল। শনি-রবিবার দুপুর একটা চল্লিশে অনুরোধের আসর বা বৃহস্পতিবার রাত্রে ছায়াছবির গান শোনেনি এমন বাঙ্গালী বিরল।

খেলার ধারাবিবরণী প্রধানতঃ ইংরিজিতেই হত। পঞ্চাশের দশকের শেষের দিকে পুন্ডেন সরকার, অজয় বোস আর প্রেমাংশু চ্যাটার্জীর হাত ধরে ফুটবল আর ক্রিকেটের বাংলা ধারাবিবরণী বাঙ্গালীর হেঁশেলে খেলার নেশা ধরিয়ে দেয়। সুকুমার সমাজপতির একটা লেখা থেকে জানা গেল পিয়ার্সন সুরিটা নাকি ক্যালকাটা ফুটবল মাঠ থেকে ধারাবিবরণী সেরে গাস্টিন প্লেসের আকাশবাণী অফিস হয়ে একশ টাকার চেক নিয়ে সোজা স্যাটারডে ক্লাবে চলে যেতেন।

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় ওনার বাণ্যবন্ধু হেমন্তের সঘন্কে একটি ছোট্ট লেখা সেয়ুগে বেতার জগতে লিখেছিলেন, "হেমন্তের কি মন্তর"। এই সব দিকপাল মানুষদের নিজেদের মধ্যে কেমন সম্পর্ক

ছিল এই ধরনের লেখা থেকে জানা যায়।

কৃষ্ণগোপাল মল্লিক নামে স্টেটসম্যান কাগজের একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক একটা পুরনো কাগজের দোকানে আকাশবাণী থেকে দেওয়া একগাদা পুরনো চেকের বাঙালি নজর করেন। ওই বাঙালি উনি কিনে নিয়ে দেখেন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শিল্পীদেরকে ওই চেকগুলো দেওয়া হয়েছিল আর সেগুলো কোন কোন ব্যাঙ্কের মারফৎ ক্লিয়ার হয়েছিল তার ওপর উনি সুন্দর একটা প্রবন্ধ বেতারজগতে লিখেছিলেন। এর থেকে জানা যায় কবি মোহিতলাল মজুমদার প্রচন্ড আবেগ মথিত কণ্ঠে একটা স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করে কুড়ি টাকার একটা চেক পেয়েছিলেন। সে চেকটি জনৈক জে এন সেনগুপ্ত নামে এক ভদ্রলোকের সেইসহ তাঁর ব্যাঙ্কের মারফৎ ক্লিয়ার হয়েছিল। এই সেনগুপ্ত মশায় ছিলেন একটা শুঁড়িখানার মালিক। সম্ভবতঃ কবি তাঁর সাপ্তাহিক ব্যয় মেটাতে এই চেকটি ব্যবহার করেছিলেন।

সুধী প্রধান একটি প্রবন্ধে বেতার শিল্পীদের সংগঠন নিয়ে লিখেছিলেন। স্বাধীনতার কিছুদিন আগে থেকেই বেতার শিল্পীদের মধ্যে পারিশ্রমিক এবং কাজের সময়সীমা নিয়ে একটা ক্ষোভ জাগতে শুরু করে। এক তবলচি দুপুরবেলা কাজের ফাঁকে ধর্মতলায় গিয়ে সময়মত ফিরতে না পারায় তার চাকরী যায়। কর্তৃপক্ষ শিল্পীদের কয়েকটা গ্রেডেশানে ভাগ করে সময়সীমা নির্ধারণ করলে কিছুদিনের জন্য সমস্যার সমাধান হয়।

সাতচল্লিশের জানুয়ারী মাসে শিল্পী সংগঠন দাবী করে নেতাজীর জন্মদিবসে বেতারে বিশেষ অনুষ্ঠান করার। কর্তৃপক্ষ পরের বছরের জন্য সমস্যাটা তুলে রেখে সে যাত্রা উদ্ধার পেয়েছিলেন। পরের বছর আটচল্লিশ সালের জানুয়ারী মাসে বেতার জগত প্রকাশ হবার পর দেখা গেল নেতাজীর উপর কোন অনুষ্ঠান সেবছরও হবে না। সংগঠনের পক্ষে সম্পাদক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সমস্ত শিল্পী আকাশবাণীর অনুষ্ঠান বয়কট করার সিদ্ধান্ত নেন। দিল্লী দরবার করলে সর্দার প্যাটেলের সেই করা চিঠিতে জানান হয় কোন ব্যক্তি বিশেষের জন্মদিন রেডিওতে পালন করা সম্ভব নয়। পরে গান্ধিজীর জন্মদিন সঘন্কে উল্লেখ করা হয় যে জাতির জনক হল ব্যতিক্রম। শিল্পীসংগঠনের প্রতিবাদ আরও বেড়ে ওঠার আগেই গান্ধিজীকে হত্যা করা হলে প্রসঙ্গটি ধামাচাপা পড়ে যায়। সুধী প্রধানের লেখাটি না পড়লে হেমন্ত বাবুর চরিত্রের এই দিকটা আমাদের কাছে অজানা থেকে যেত।

আকাশবাণীর সিগনেচার টিউন দিয়ে লেখাটা শুরু করেছিলাম। অর্পূর্ব এই সুরের সৃষ্টিকর্তা হলেন ব্রিটেন থেকে আসা দুই কম্পোজার, জন ফোল্ডস ও ওয়াল্টার কফম্যান। নিশ্চিত না হলেও অনেকে মত প্রকাশ করেছেন যে এটিতে বেহালা বাজিয়েছিলেন জনৈক মেহদি মেহতা, বয়ে স্টেশনের একজন স্টাফ আর্টিস্ট, যিনি পৃথিবী বিখ্যাত কনডাক্টর জুবিন মেহতার পিতা।

ভাবতে অবাক লাগে কি অদ্ভুত এক জাদুতে কোলকাতা বেতার এত বিরাট একটা জনগোষ্ঠীকে এক ছাতার তলায় নিয়ে এসেছিল। ■

বিদেশে যারা বসবাস করেন, প্রত্যেকেই কোন না কোন অবসরে দেশে যাওয়ার হাতছানিকে গ্রহণ করেন। কখনো পারিবারিক তাগিদে, কখনও নিছক বেড়াবার সুযোগে, আবার কখনো “অনেক দিন যাই নি, একবার ঘুরে আসি এই আবেগে”।

এই শেষেরটিকে অবলম্বন ক’রে কিছুদিন আগে ভারতবর্ষে গিয়েছিলাম। প্রিয়জনের সঙ্গে দেখা, বেড়ানো, বিবিধ খাওয়া দাওয়া মিলে ভাল সময় কাটে। তারই মাঝে কিছু কিছু ঘটনা, কিছু কার্যকলাপ মনকে স্পর্শ করে, দারুণ আমোদ দেয়।

আমি মূলত উত্তর কলকাতায় বড় হয়েছি। সেখানে নানা স্তরের পুরনো মানুষজনের বসবাস। বুদ্ধিজীবী, চাকুরিজীবী, ব্যবসায়ী ---সকলে মিলে থাকেন। এমনি একটি মানুষ টুটে দা। উত্তর কলকাতায় মিনিবাসের ব্যবসা করেন ও বাড়ীতে ছোট একটি প্রেস চালান। বিভিন্ন গন্তব্যস্থলে তাঁর মিনিবাস যাতায়াত করে। আরামপ্রিয় টুটে দা, লুচি-আলুছেঁচকি ও দিবানিদ্রার ফাঁকে অসাধারণ দক্ষতার সাথে ব্যবসা চালান। কিছু নিয়মের ব্যাপারে তিনি খুব কড়া। অনেক কলকাতাবাসীর টিকিটের দাম না দিয়ে টুক ক’রে বাস থেকে নেমে যাওয়ার অভ্যেস আছে। টুটে দার মিনিবাসের নামার দরজার ধারে লেখা ---

“টা টা বাই বাই  
টিকিট কেটে বাড়ী যাই”।

কোন এক হরতাল বা ধর্মঘটের দিন টুটে দার মিনিবাস আটকে যায়। বেআইনি জায়গায় রাখার জন্য বড় জরিমানা হয়। বহু চেষ্টা করেও লাঘব করা যায়নি। অর্থদণ্ড তাঁকে দিতেই হয়। টুটে দা দমবার লোক নন। বড় বড় সাদা অক্ষরে মিনিবাসের পিছনে লিখে দিয়েছেন ---“বল্ মা আমি দাঁড়াই কোথা”।

উত্তর কলকাতায় অনেকেই বংশ পরম্পরায় একই বাড়ীতে রয়ে গেছেন। অনেক পরিবার আছেন যেখানে ঠাকুরদাদা থেকে প্রপৌত্র পর্যন্ত একত্রে থাকেন। যেমন হাটখোলা, আহিরিটোলা ইত্যাদি এলাকায় দেখা যায়। এদের নামকরণও খুব সাবেকী হত। জ্ঞানদারঞ্জন, প্রফুল্লবিহারী ইত্যাদি। এইসব মানুষ যাঁরা এখন ঠাকুরদা শ্রেণীতে, যুগের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নাতি নাতনীদেব প্রগতিশীল নামকরণ করেছেন। পুরনো বাগবাজার এলাকার তারিণীচরণ মহাশয় নিজের ছেলের নাম রেখেছিলেন বিপ্রদাস। তিনিই এখন দুই নাতির আধুনিক নামকরণ করেছেন স্বরাজ, বিপ্লব ও নাতনী স্বাধীনা।

Vegan এর যথেষ্ট প্রভাব ছড়িয়ে গেছে সর্বত্র। তবে অবাধ হলাম যে তরুণ তরুণীরা কত প্রভাবিত এর দ্বারা। বিদেশ থেকে আমরা যখন দেশে যাই, শরীর খারাপ হয়ে যাওয়ার একটা প্রবল সম্ভাবনা থাকে। ফোটা নো জল, হ্যান্ড স্যানিটাইজার নিয়মিত লাগে। এক আত্মীয়্যর বাড়ীতে দেখা করতে গিয়েছিলাম। অতি বিবেচক তিনি, আপ্যায়নের জন্য দই, সাদা সন্দেশ ও ডাবের জল রাখেন। দারুণ আনন্দিত হই তাঁর এই চেতনায়। সবে ডাবের জল খেতে শুরু করেছি, তাঁর ছোট টিনএজার ফুটফুটে মেয়ে বললো, “পুরো ডাবের জল খেও না। এখন এত গরম, কিছুটা মুখে মাখিয়ে নাও।

ডাবের জল হল ন্যাচারাল অ্যান্টি ব্লিমিশ। লোশন, ময়েশচারাইজার বা আর কিছু লাগবে না”। শুনলাম খাওয়া দাওয়া, রূপচর্চা সবই নাকি সে Vegan মতে করে। সুবিধে অসুবিধে, কোথায় কি পাওয়া যায়, সেগুলো বড় কথা নয়। একটি ছোট মেয়ের নিষ্ঠা ও সংযম দেখে মোহিত হতে হয়।

দোকান বাজারে ঘুরতে ঘুরতে কয়েকটা জিনিসের প্রয়োজন এসেই যায়। কয়েকটা কাপড়ের পিস কেনার কথা মনে হল। জিজ্ঞেস করলাম লাল কাপড়ের জন্য। বিক্রেতার বিস্তারিত জবাব এল, “কোন লাল? টুকটুকে লাল, পোড়া লাল, টমেটো লাল, তরমুজ লাল”? এতগুলো বিকল্পের মধ্যে কেমন যেন বিভ্রান্ত লাগলো। নিরাপদ হবে ভেবে বললাম, “আচ্ছা, ভাল সাদা কাপড় দিন”। তৎক্ষণাৎ জবাব, “কোন সাদা? দুধ সাদা, মুক্তো সাদা, সার্ক সাদা”?

দেশে ঘোরার মেয়াদ প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। ঠিক করলাম কয়েক দিনের জন্য বাঁকুড়া যাব। বাঁকুড়া আমাদের আদি বাড়ী। হাতে গোনা কয়েকজন প্রবীণ এখনও সেখানে জীবিত। একবার দেখা ক’রে আসার লোভ সামলাতে পারলাম না। খুবই তৃপ্তিদায়ক অভিজ্ঞতা। ৮-৪ বছরের রাজপিসীর নিজের হাতে রান্না ক’রে খাওয়ানো মোচার ঘন্ট এবং শুজোর স্বাদ অনেক দিন থাকবে আমার সঙ্গে। তাঁর সরল স্মৃতি রোমন্থনে মন ভরে গেল। সেই সময় যখন ৭০ পয়সা ইলিশ মাছের কিলো ছিল, ১ টাকা ৫ পয়সায় ১ মণ চাল পাওয়া যেত।

বাঁকুড়া শহরতলী জায়গা। ১ সপ্তাহ ব্যাপী যাত্রাপালা চলছিল সে সময়। রাজপিসীর উৎসাহ এখনো যথেষ্ট। একটিও যাত্রা দেখা বাদ যায়নি। আর আমার প্রায় ২৭ বছর পরে খোলা মাঠে সতরঞ্চিতে বসে যাত্রা দেখার সুযোগ আবার হল। প্রচুর উন্নতি হয়েছে যাত্রার স্টেজ, পোষাক, মাইক্রোফোন, আলো ইত্যাদির। তবে আসল আকর্ষণ ছিল যাত্রার নামকরণ ---“মাগো, তোমায় আমি ভুলবো না”। অন্য দলও পিছিয়ে নেই। পরের দিনই তারা উপস্থাপন করেন “কলির মা ভিক্ষে চায়”। স্নেহময়ী জননী ও তার পরিণাম নিয়ে প্রতিযোগিতা। আবার স্টেজের পর্দা উঠতেই ঝলমলে আলোতে নেতা বেশে এক যাত্রাসম্রাট ধমকে ওঠেন, “তোমরা গণতন্ত্রকে হত্যা করেছো”! নির্দোষ গ্রামবাসী রূপে আরেক অভিনেতা কাতর কণ্ঠে বলে ওঠেন, “গণতন্ত্র বাবুকে এখানে কেউ দেখিনি কোনদিন”। দর্শনভিত্তিক বিষয় নিয়ে যাত্রার নাম ছিল, “অপরাধ আমি মেয়ে”। তবে যে নামকে বোধহয় কেউ পরাভূত করতে পারবে না, যেখানে সব রকম ভাষাভাষি দিয়ে সাজানো যাত্রা, তার নাম “বাবু গো, ভালবাসা ভাল নয়”।

ছুটি শেষে বাড়ী ফেরার পালা। দেশের সুবিধে, অসুবিধে, সহজ, কঠিন নিয়ে বলার অনেক কিছুই থাকে। ভালমন্দ, ভাল লাগা, না লাগা সবই ব্যক্তিগত অনুভূতি। তবে যেখানে দৈনন্দিন জীবনে সব কিছুকে উপেক্ষা ক’রে আমোদের এত উপাদান, তাকে অস্বীকার করা কি সহজ কথা? এখানে আমার আবার আসা হবে হয়তো কয়েক বছর পরে। শুধু ভাবলাম, যে জায়গা বিনামূল্যে এত বিনোদন দেয় মানুষকে, সেখানে একবার নয়, শত সহস্র বার যেন ফিরে আসতে পারি। ■

সেই দিন খবরের কাগজে ডিজনির ল্যান্ড নিয়ে একটি প্রবন্ধ পড়লাম। তরুণ-তরুণীদের উপর এক সমীক্ষা চালানো হয় টোকিওর পাশে উরায়াসু শহরে অবস্থিত এই থীম পার্ক নিয়ে। তাদের কাছে জানতে চাওয়া হয়, ডিজনির ল্যান্ডের নাম শুনে অনুষ্ণ হিসাবে কোন বিদেশের কথা মনে পড়ে তোমাদের? স্বভাবতই আশা করা হয়েছিল সবাই উল্লেখ করবে আমেরিকার নাম, কারণ ডিজনির ল্যান্ডের উৎপত্তি যে যুক্তরাষ্ট্রে সে কথা সবার জানা। কিন্তু সমীক্ষাকারীদের অবাধ করে দিয়ে কেউই আমেরিকার নাম উল্লেখ করে নি। পরিবর্তে অনেকেই লিখেছে ‘স্বপ্নের দেশ’।

সেই স্বপ্নের দেশ থেকে ঘুরে এলাম জুলাই মাসের ১১ ও ১২ তারিখে। এটি ছিল স্বপ্নের দেশে আমার দ্বিতীয় পরিভ্রমণ। এর আগে গিয়েছিলাম ২৩ বছর আগে, যখন আমাদের ছোট মেয়ে সবে প্রাইমারি স্কুলে ঢুকেছে। এক শতাব্দীর এক চতুর্থাংশের মত দীর্ঘ সময় যে যাওয়া হয় নি, বা যেতে চাই নি, অবশ্যই তার কারণ ছিল। সেটি হল, ডিজনির ল্যান্ডে যে সব সময় ভিড় লেগে থাকে, তা সহ্য হয় নি। ২৩ বছর আগে যখন গিয়েছিলাম, কোনো কোনো রাইডে চড়ার আগে দু-দু ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হয়েছিল। এছাড়াও যেখানে যাই না কেন, এমন জায়গা নেই যেখানে ভিড় নেই। রেস্টোরার সামনে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর আমার প্লেটে অতি সাধারণ খাবার পরিবেশন করা হোল দেখে হতাশ হয়েছিলাম। প্রথম প্রথম বাচ্চারায় বায়না করত ডিজনির ল্যান্ডে নিয়ে চলো বলে, কিন্তু আমি রাজী হচ্ছি না দেখে ওরা শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিল। অবশ্য ততদিনে ওরা যথেষ্ট বড় হয়েছে এবং মা-বাবা ছাড়াই তাদের বন্ধু-বান্ধবীদের সঙ্গে সেখানে যেতে শিখেছে।

সেই আমি কেন এবার ডিজনির ল্যান্ড এবং ডিজনি সী, ২৩ বছর আগে যার অস্তিত্বই ছিল না, সেখানে যেতে রাজী হলাম?

আসলে আমি কেবল রাজী হই নি, বরং ওখানে যাওয়ার উদ্যোগ নিয়েছিলাম। উপলক্ষ ছিল স্ত্রী সুমিকোর ‘কানরেকি’। জাপানি ভাষায় ‘কানরেকি’-র মানে ৬০ বছর বয়স। আমাদের পুরনো বিশ্বাস, ৬০ বছর বয়সে মানুষ একটা জীবন শেষ করে নতুন জীবন শুরু করে। এর ভিত্তিতে রয়েছে টানে উদ্ভাবিত রাশিচক্রের ধারণা, যেখানে ১২ বছরকে জীবনযাত্রার একটি ইউনিট হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং এই ইউনিটকে পাঁচ বার পরিক্রমা করলে অর্থাৎ ৬০ বছরে জীবনের চক্র সম্পন্ন হয়। এই কানরেকি-র বয়স এখনো আমাদের জীবনের একটি বড় সন্ধিক্ষণ হিসাবে বিবেচিত হয়।

স্ত্রীর কানরেকি কিভাবে উদযাপন করা যায়, তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করছিলাম। হঠাৎ ডিজনির ল্যান্ডের কথা মনে পড়ল। এর কিছু পটভূমিও ছিল। কিছু দিন আগে সুমিকো ডিজনির ল্যান্ড বেড়াতে গিয়েছিল ওর বন্ধুদের সঙ্গে। ৪-৫ জনের গ্রুপ, সবাই ওর কাছাকাছি বয়সী মহিলারা। বিশ্বের যে কোনও দেশের, বা যে কোনও জাতিরই হোন না কেন, এই বয়সী মাসিমাদের এই পৃথিবীতে ভয়ের কিছু নেই। গ্রুপের নেতা ছিলেন যিনি, তিনি ডিজনির ল্যান্ডের বড় ভক্ত। বছরে ৩-৪ বার ডিজনির ল্যান্ড ও ডিজনি সী থেকে ঘুরে আসেন। কোথায় কিভাবে গেলে এই থীম পার্কটিকে পুরোপুরি উপভোগ করা যায়, সেটি তার নখদর্পণে। এই অভিজ্ঞ নেত্রীর নেতৃত্বে সে দিন আমার স্ত্রী বড় আনন্দের দিন কাটিয়ে এসেছিল ডিজনির ল্যান্ডে। ফিরে এসে সেই আনন্দের অভিজ্ঞতার কথা জোর করে শুনিয়েছিল আমাকে। সেই সঙ্গে বলল, ওর একটা আফসোস থেকে গেল আর সেটি হল, ডিজনি সীতে যাওয়া হল না।

কথাটা শুনে ডিজনি সীতে যাওয়ার আইডিয়াটা আমার মাথায় এসেছে। ও সেই অভিজ্ঞ নেত্রীর কাছ থেকে যে কৌশল শিখে এসেছে, তা প্রয়োগ করলে নাকি লাইনে দাঁড়ানোর সময় কমানো যায়। তাহলে আমার আর আপত্তি নেই। তবে সব থেকে বড় কথা, আমাদের নাতনীরা খুব খুশি হবে। খুলে বলি, স্ত্রীর চেয়ে বরং নাতনীদের খুশি করার জন্যই বহু বছর পর আমার ডিজনির ল্যান্ড যাওয়া হল।

সেই সঙ্গে আরেকটা আইডিয়া মাথায় এসেছে। একবার যদি যাই, ওখানে এক রাত থাকলে কেমন হয়? ইন্টারনেট সার্চ করে জানা গেল, ডিজনির ল্যান্ডের আশেপাশে তিনটি হোটেল আছে যেগুলি ডিজনির ল্যান্ডের অফিশিয়াল হোটেল হিসাবে স্বীকৃত। ট্রাভেল এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ করে তিনটি হোটেলের মধ্যে ডিজনির ল্যান্ড হোটেলে বুকিং পাওয়া গেল।

১১ই জুলাই স্ত্রীর ৬০তম জন্ম দিনে আমরা ৬ জন, আমি, আমার স্ত্রী, বড় মেয়ে, ওর স্বামী অর্থাৎ আমাদের জামাই আর ওদের দুই মেয়ে এক সঙ্গে ডিজনি সীতে গিয়ে হাজির। ছেলে, বৌমা, ওদের ৩ মেয়ে ও আমাদের ছোট মেয়ে পরে হোটেলে এসে জয়েন করবে। টানা কয়েক দিন বৃষ্টির পর সে দিন ছিল রৌদ্রোজ্জ্বল গরম দিন। সেই গরমের মধ্যে জামাই-এর ছুটাছুটি শুরু হয় ফাস্ট পাস হস্তগত করার জন্য। এমন সিস্টেম সম্ভবত ২৩ বছর আগে ছিল না। ওর অক্লান্ত চেষ্টায় সে দিন ৪-৫টা স্পটে প্রবেশ করতে পেরেছিলাম। ৩ বছরের নাতনী আইয়াকা এক ধরনের গুটিং গেমের বড় পয়েন্ট অর্জন করে সবাইকে অবাধ করে দিল।

হোটেল গিয়ে ঘরে যাওয়ার জন্য লিফটে উঠলাম। তখন হঠাৎ মিকি মাউসের কণ্ঠ ভেসে আসছে ‘দরজা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে’ বলে। শুনে নাতনী দারুণ খুশি।

সে দিন সবাই মিলে ডিনার খেতে গিয়েছিলাম ডিজনির ল্যান্ড হোটেলের “শেফ মিকি রেস্টোরান্ট”-তে। এই রেস্টোরান্ট বড় আকর্ষণ হল মিকি মাউস, মিনি মাউস ও ডোনাল্ড ডাকরা পর পর খাবারের টেবিলে এসে গেস্টদের আপ্যায়ন করে। ওরা গেলে সব টেবিলে আনন্দের ঝড় গুঠে। আমাদের টেবিলও বাদ পড়ে নি। আমরা সবাই মিলে মিকি মাউসদের সঙ্গে ছবি তুললাম এবং ওদের অটোগ্রাফ নিলাম। বুফে স্টাইলে বিভিন্ন খাবার সাজানো থাকলেও বাচ্চাদের মনোযোগ মিকিদের দিকে, খাওয়ার ইচ্ছা নেই। এটা ডিজনির ল্যান্ড হোটেলের কৌশল হতে পারে।

পরের দিন ডিজনির ল্যান্ডে গেলাম। এক পর্যায়ে দেখলাম, মিকি মাউসরা এসে মঞ্চের উপরে নাচ করছে। ওদের পরনে জাপানের উৎসবের সময়ে পরার পোশাক “হান্সি” আর জাপানি স্টাইলের ঢাক বাজাতে বাজাতে ওরা নাচছে। আমেরিকায় জন্ম নেওয়া সেই হুঁদুরটি একেবারে জাপানের মাটিতে মিশে গেছে। মিকি মাউসদের ঢাকে সাড়া দিয়ে শিশুরাও মঞ্চের পাশে নেচেছিল। আমার নাতনীরাও স্থানন্দে তাতে যোগ দিল।

সে দিন রাত পর্যন্ত ডিজনির ল্যান্ডে সময় কাটিয়েছিলাম। গরম এবং ভিড়ে রীতিমত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। তখন বড় নাতনী ৭ বছরের ইবুকি যেন মনে মনে বলছে এমন ভঙ্গিতে বলল, “সময় যদি পিছনে ঘুরিয়ে নিতে পারতাম, কতই না ভাল হত।” কথাটা শুনে সঙ্গে সঙ্গে আমার ক্লান্তি দূর হয়ে গেল। ওদের চমৎকার সময় কাটাতে দিতে পেরেছি, স্বপ্নের দেশে বেড়াতে দিতে পেরেছি, সেই আনন্দে আমার মন ভরে গেল। স্ত্রীর কানরেকি উদযাপনের কথা আর মনে নেই। ■





বিয়ের কয়েক মাসের মধ্যেই শৈবাল ভালভাবে উপলব্ধি করতে পারে যে তার স্ত্রী রাধিকা এবং সে দুই ভিন্ন মেরুর মানুষ। দু'জনের জীবন দর্শন সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেটা উপলব্ধি করার পর থেকে শৈবাল রাধিকার পছন্দ অপছন্দের উপর বিশেষ নজর দিতে আরম্ভ করে যাতে তাদের দাম্পত্য জীবনে কোনও বাড়া বাপটা না আসে।

রাধিকা ইন্ট্রোভার্ট, বেশি লোকজন ও হৈ হটগোল পছন্দ করেনা, যেটা বিয়ের আগে শৈবালের বাড়িতে প্রায়ই লেগে থাকতো। শৈবাল নিজে খুব মিশুক এবং ওর আত্মীয়দের খুব প্রিয় পাত্র। তাছাড়া শৈবালের বাবা মাকে পরিবারের সবাই খুব মান্যগণ্য করে। তাই শৈবালদের বাড়িতে একসময় ভালই লোক সমাগম হোত। অনুষ্ঠান থাকলে তো কথাই নেই। গল্পগুজব, হাসি ঠাট্টায় বাড়ির পরিবেশটাই অন্যরকম ছিল। রাধিকার অপছন্দের কথা মাথায় রেখে এখন আর কথায় কথায় লোক ডাকা হয়না। বন্ধুরা বাড়িতে আড্ডা মারতে আসতে চাইলে নানা অজুহাত দেখিয়ে সেটা এড়িয়ে যায়। আত্মীয়রা আগাম খবর না দিয়ে দুম ক'রে বাড়িতে এসে পড়লে ভীষণ বিপদে পড়ে যায়। রাধিকার শরীরটা ভাল নেই, এই অছিলায় তাকে সামনে আনতে চায়না। এসব নিয়ে মাঝে মাঝে মন বিদ্রোহ ক'রে ওঠে ঠিকই, কিন্তু বিবাহিত জীবনকে সুন্দর ও মধুময় ক'রে তোলার জন্য নিজের স্বার্থ ত্যাগ করতেও সে প্রস্তুত।

ছুটির দিনের পড়ন্ত বিকেলে যখন পাড়া প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে হাসিঠাট্টার আওয়াজ ভেসে আসে, তখন মনটা হঠাৎ অব্যাহার মত পুরোনো দিনগুলির স্মৃতিকে টেনে আনতে শুরু করে। শৈবাল অনুভব করতে পারে সে ক্রমশই অসামাজিক হয়ে পড়ছে। বাবা মা এই নিয়ে তাদের অসন্তোষ প্রকাশ না করলেও তারা যে রাধিকাকে নিয়ে চিন্তিত, সেটা বুঝতে পারে। কিন্তু শৈবাল নিরুপায়। বিবাহিত জীবনের ভারসাম্য বজায় রাখার দাবীকে সে অগ্রাহ্য করে কি করে? শৈবালের বিয়েটা যেহেতু তার বাবা-মারই ঠিক করা, তাই ওর বাবা মা নিজেদের অদৃষ্টকেই দোষারোপ করেন। শৈবালের সঙ্গে এ ব্যাপারে কোনও আলোচনায় যেতে চাননা, পাছে সে কষ্ট পায়। অনেক সাধ ক'রে ছেলের বিয়ে দিয়ে ভেবেছিলেন বাড়িতে লোক সমাগমের ধারাবাহিকতা অটুট থাকবে। বাড়িতে সর্বদাই খুশীর বন্যা বয়ে যাবে। কিন্তু তা তো হোলই না, উল্টে ছেলেকে নিজের সাথে যুদ্ধ করতে দেখে তারাও মনে মনে কষ্ট পায়। অবশ্য এই প্রসঙ্গে একটা কথা উল্লেখ না করলে সত্যের অপলাপ হবে, তা হোল রাধিকা শ্বশুর শাশুড়ীকে কখনও অশ্রদ্ধা করেনা। তাদের প্রতি দায়িত্ব সে ঠিকমত পালন করে। কিন্তু শুধু দায়িত্ব পালন করলেই তো সব হয়না। সংসার সুখের হয় আত্মার সাথে আত্মার মিলনে। রাধিকাকে খুব কম দেখা যায় শ্বশুর শাশুড়ীর সঙ্গে গল্পগুজব করতে। শৈবাল অফিসে যাওয়া থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত রাধিকা নিজের ঘরেই থাকে। বই পড়ে, গুণগুণ ক'রে গান করে এবং ছবি আঁকে। রাধিকা খুব ভাল পোর্ট্রেট আঁকতে পারে। এটা ওর বাবার কাছ থেকে শেখা। এসব যে শৈবাল ভালোবাসে না তা নয়। কখনও সখনও রাধিকার আঁকা ছবি ও খুব মনোযোগ দিয়ে দেখে, এবং নিজের সূচিন্তিত মতামতও প্রকাশ করে। সত্যি কথা বলতে কি রাধিকার আঁকা ছবি আরো লোকে দেখুক, ও একটা স্বীকৃতি পাক, মনে মনে সেটাই শৈবাল চেয়েছে। রাধিকার প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও কখনও কিছু কিছু ছবি অন্যদের দেখিয়েছে। হয়তো ভেবেছে আঁকাআঁকির মধ্যে দিয়ে যদি রাধিকাকে আর একটু সামাজিক করে তোলা যায়। কিন্তু নানান কাজের চাপে সেই ইচ্ছেটা আর পূরণ করা সম্ভবপর হয়নি। নিজেই কখন নিজের মনের সাথে আপোষ করে নিয়েছে। রাধিকার মা নেই, বাবা আছেন। তিনি মাঝে মাঝে মেয়েকে দেখতে আসেন। নির্দিষ্ট গণ্ডীর বাইরে এই একটা জায়গাতেই রাধিকার কিছুটা স্বচ্ছন্দ বিচরণ।

সেদিন শৈবাল তার অন্তরঙ্গ বন্ধু রণজয়ের সঙ্গে চা খেতে খেতে রাধিকার ব্যাপারে কথা বলছিল। রণজয়কে অনেক কথাই সে নিশ্চিন্তে বলতে পারে, কারণ বন্ধুর সমস্যা নিজের সমস্যা মনে ক'রে এর থেকে কি ক'রে পরিত্রাণ পাওয়া যায় সেই চেষ্টাই রণজয়

করে। শৈবালের কাছ থেকে সব কথা শুনে একটু ভেবেচিন্তে রণজয় শৈবালকে জিজ্ঞাসা করে, “আচ্ছা একটা কথা বল, তোদের কি এখনই ফ্যামিলির সদস্য সংখ্যা বাড়ানোর কোনও পরিকল্পনা আছে?” শৈবাল জানায়, না এখনই সে রকম কোনও পরিকল্পনা নেই। “বাস্ বাস্, তাহলেই হবে”, বললো রণজয়। শৈবাল রণজয়ের দিকে তাকিয়েই বুঝলো সমস্যা সমাধানের কিছু একটা গ্ল্যান ঘুরছে ওর মাথায়। একটা সিগারেট ধরিয়ে রণজয় পর পর কয়েকটা ধোঁয়া ছেড়ে আবার শৈবালকে জিজ্ঞাসা করে, “আচ্ছা শৈবাল, তোর স্ত্রী তো ইংরেজিতে এম এ, তাই না?” শৈবাল ঘাড় নাড়তেই রণজয় লাফিয়ে উঠে বললো, “ভেরি গুড! শোন আমাদের বরণের অফিসে এইচ আর ডিপার্টমেন্টে শুনেছি ভাল ইংরেজি জানা লোকের প্রয়োজন। তুই চাইলে আমি বরণের সঙ্গে কথা ব'লে দেখতে পারি। তাছাড়া ওদের অফিসের এইচ আর হেড মিঃ দাশগুপ্তের সঙ্গেও আমার বিশেষ পরিচয় আছে। আমি মিঃ দাশগুপ্তকে রিকোয়েস্ট করলে রাধিকার চাকরিটা হয়ে যেতে পারে। বুঝলি তো একবার চাকরিতে ঢুকলে, পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশা করলে তোর স্ত্রীর ইন্ট্রোভার্টনেসটা কেটে যাবে। রণজয়ের কথা শুনতে শুনতে শৈবাল হুঁ হা ছাড়া আর কিছুই বলে না। কারণ সে ভাল ক'রেই জানে রাধিকাকে চাকরির কথা বললে সে কখনই রাজি হবে না। চাকরির ব্যাপারে ওর কোনও ধারণাই নেই। এসব কথা ভাবতে ভাবতে চিন্তার মধ্যে ডুবে যায় সে। মনের মধ্যে শুরু হয় এক মিশ্র প্রতিক্রিয়া। মুহূর্তের জন্য একটা ভালো লাগার অনুভূতিতে মনটা আনন্দে নেচে ওঠে। কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে হয় অফিসের একগাদা লোকের মধ্যে রাধিকার মত মেয়ে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবে?। রণজয় ওর গায়ে ধাক্কা মেরে বললো, “কি ভাবছিস বলতো? স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে আমাকে খবর দিস। তোর কাছ থেকে সিগন্যাল পেলেই আমি মিঃ দাশগুপ্তের সঙ্গে কথা ইনিসিয়েট করবো”। রণজয়ের প্রস্তাব শুধু যে ভাল, তাই নয়, এই অসুখের মোক্ষম দাওয়াইও বটে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু সমস্যা একটাই, রাধিকাকে রাজী করানো।

কয়েকদিন কেটে গিয়েছে, বলবো বলবো করেও কথাটা রাধিকার কাছে বলে উঠতে পারে নি। সেদিন ছিল শুক্রবার, এমনিতেই অফিসটা প্রায় ভাঙ্গা হাটের মত লাগছিল। তার উপর আবার বিকেল হতে না হতেই পশ্চিমের আকাশে কালো করে জমতে থাকে মেঘ। আকাশের সেই ঘনঘটা দেখে চিন্তিত হয় শৈবাল। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যাওয়াই শ্রেয় মনে করে বাড়ির দিকে রওনা দেয়। বৃষ্টি শুরু হওয়ার আগেই বাড়ি পৌঁছাতে পেরে নিজেই নিজের বিবেচনাকে বাহবা দেয়। বাড়ি ফিরে দেখে রাধিকা বেশ ভাল মুডেই আছে। রেকর্ড প্লেয়ারে ভূপেন হাজারিকার গান চালিয়ে নিজের বিয়ের বেনারসী শাড়িটা সযত্নে ভাঁজ করছে। দু-একটা মামুলি কথা আদান প্রদানের পরই শৈবালের মনে হয় এমন সুযোগ হাতছাড়া করা উচিত হবে না। তাই সাত পাঁচ চিন্তা না করেই রাধিকাকে বলে ফেলে, “তোমাকে একটা কথা বলতে চাই। বলা ভাল একটা প্রস্তাব দিতে চাই”। রাধিকা সোজা শৈবালের দিকে তাকিয়ে বললো, “হ্যাঁ, বল কি বলতে চাও”। এই কদিন ধরে শৈবাল ভিতরে ভিতরে অনেক সাহস সঞ্চয় করেছে। তবুও এই মুহূর্তে কি ভাবে শুরু করবে বুঝতে পারে না। কড়কড় করে কাছেই কোথায় একটা বাজ পড়ার শব্দ হয়। খানিকটা চুপ করে থেকে নিশ্চলতা ভঙ্গ করে বলে, “আসলে বলছিলাম কি, তুমি কি কোনদিন চাকরি করবার কথা ভেবেছো? যদি ভাব, তাহলে সে ব্যাপারে তোমাকে আমি সাহায্য করতে পারি”। “হঠাৎ আমার চাকরি করার কথা উঠছে কেন?” রাধিকার গলায় বিস্ময়ের সুর। “না তোমার চাকরি করার কথা এই কারণে উঠলো যে আমার বন্ধু রণজয় বলছিল তোর স্ত্রী তো ইংরেজিতে এম এ। কোনও অকুপেশন নেই বাড়িতে বসে বসে নিশ্চয়ই বোর ফিল করছে। রণজয় বলছিল তুমি চাইলে ও বরণদের অফিসের এইচ আরের সঙ্গে কথা বলতে পারে”। প্রায় এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে ফেলে শৈবাল।

রাধিকার উত্তরের জন্য শৈবাল ওর দিকে তাকায় ভয়ে ভয়ে।

কিন্তু এই মুহুর্তে শৈবাল যেন বিরাজ করছে সম্পূর্ণ অন্য কোন এক জগতে। বাইরে শুরু হয়েছে মুঘলধারে বৃষ্টি। তার একটানা আওয়াজকে ছাপিয়ে ওর কানে বাজছে শুধু ভূপেন হাজারিকার গান ... “মানুষ মানুষের জন্যে...”

সন্ধ্যা ফিরে আসে রাধিকার উত্তরে। খুব শান্ত গলায় সে জানায়, “তোমার বন্ধুকে বলে দিও আমি এই প্রস্তাবে রাজী”। রাধিকা যে এক কথায় রাজী হয়ে যাবে শৈবাল সে কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি। বেশ কিছুক্ষণ লাগে ব্যাপারটা অনুধাবন করতে। তারপর চেষ্টা করেও মনের আনন্দটা রাধিকার কাছে চেপে রাখতে পারে না। যাক, এইবার স্ত্রীকে নিশ্চয়ই একটু সোশ্যাল করা যাবে, এই আনন্দে বৃষ্টির মধ্যেই ছুটে বেরিয়ে গেল পাড়ার দোকান থেকে কিছু মুখরোচক খাবার কিনে আনতে। শৈবালকে হাসিমুখে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে দেখে রাধিকা পিছন থেকে বলে ওঠে, “বন্ধুকে ফাইনাল কিছু বলার আগে একবার মা বাবার অনুমতিটা নিয়ে নিও”। “হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই নিয়ে তুমি চিন্তা কোরনা।” কোনওরকমে এই কথাটুকু বলতে বলতে শৈবাল বেরিয়ে যায় বাইরে।

পরের দিন শনিবার, অফিস ছুটি। অনেকদিন পর রাতে একটু ভাল ঘুম হওয়ায় শরীরটা বেশ ঝরঝরে লাগছে। দুপুরে খাওয়ার সময় বাবার কাছে কথাটা তোলে শৈবাল। অপ্রত্যাশিত উত্তর আসে বাবার কাছ থেকে, “কি বলছো? বৌমা চাকরি করবে? কিন্তু কেন?” শৈবাল একটু ঢোক গিলে বলে, “চাকরি করলে অনেক লোকজনের সঙ্গে একটু ইন্টারঅ্যাকশন করার সুযোগ হয়। ওকে সবাই আনসোশ্যাল বলে। শুনতে স্বাভাবিকভাবেই আমার খারাপ লাগে। চাকরি করলে আশাকরি সেটা আর থাকবে না”। শৈবালকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বাবা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ শান্ত গলায় বলেন, “কিন্তু কারোর উপর জোর করে কিছু চাপিয়ে দেওয়াটা কি ঠিক? ওর মন কি চায়, সেটা বুঝে ওকে আমাদের সোশ্যাল হতে সাহায্য করতে হবে। বৌমার বাবার কাছ থেকে শুনেছি মায়ের আকস্মিক

মৃত্যুতে ও নিজেকে এভাবে গুটিয়ে রেখেছে। তাছাড়া অত্যাধুনিক মেয়েদের নানান ভয়াবহ পরিণতির খবরও তো আমরা প্রায়ই কাগজে পাই”।

মা খাবার পরিবেশন করতে করতে বাবার কথা মন দিয়ে শুনছিলেন। বাবা থামতেই মা বললেন, “জানিস সবু, গতকাল তোরা ছোটমাসী এসেছিল দেখা করতে। বৌমার সঙ্গে অনেকক্ষণ কাটালো, তোদের বিয়ের পর এই প্রথম। ছোটমাসী তো খুব খুশী। যাওয়ার সময় আমাকে বলে গেছে, “সত্যি দিদি, সবু বৌ খুব লক্ষ্মী। স্বভাবে কোনও উগ্রতা নেই। কথা কম বলে ঠিকই, কিন্তু যেটুকু বলে তাতে বুদ্ধিমত্তার ছাপ থাকে। সবু বৌয়ের মত মেয়েরাই পারে সংসারটা বেঁধে রাখতে। চাপা স্বভাবের মেয়েদের ভাল দিকটা কি জানিস দিদি, ওরা দুঃখ সহ্যে পারে, কিন্তু ভুলেও অন্য কাউকে দুঃখ দেয় না”।

মায়ের মুখ থেকে ছোটমাসীর কথাগুলো শুনে শৈবালের মনটা অনেকদিন পর বেশ খানিকটা হালকা বোধ হয়। খানিকক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে জানলার বাইরে। গতকাল রাতের বৃষ্টির পর বাইরের আগাছাগুলো যেন এক রাতে অনেকটা বেড়ে উঠেছে। কতকগুলো চড়ুই পাখী মনের আনন্দে খেলা করছে মাঠের মাঝখানটায়। শৈবালের ইচ্ছে হল অনেকদিন পর কবিতার খাতাটা বার করে কিছু লেখে। বুকের ভিতরের পাথরটা যেন কেউ ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে।

দু তিন দিন পর একদিন অফিস থেকে বাড়ি ফিরে এসে শৈবাল দেখে বসার ঘরে বাবা তাঁর অতি প্রিয় ট্রানজিস্টরটা নিয়ে একমনে গান শুনছেন আর রাধিকা সামনে বসে বাবার পোর্ট্রেট আঁকছে। শৈবালের কাছে সেটা বাবার পোর্ট্রেট মনে হোল না। মনে হোল, রাধিকা ওদের সংসারের খুশীর ছবি আঁকছে।।



এটা নেহাতই একটা গল্প, কারোর 'হাঁড়ির-খবর' নয়। আমার বৌ লিভা কাজে বেরোনোর আগে আমাকে কয়েকটা ঠেলা মেরে ঘুম থেকে উঠিয়ে দিয়ে গেলো। বলে গেলো যে ও বেরোচ্ছে, আমি যেন ভেতর থেকে দরজার 'চাইল্ড-সেফটি-ল্যাচ'-টা ঠিকঠাক লাগিয়ে দি। আড়মোড়া ভেঙ্গে আমি একবার খাটের পাশের অ্যালার্ম-ক্লকটার দিকে তাকিয়ে নিলাম, সকাল সাড়ে-ছটা। মেয়ে তিনটির দিকেও একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম। ওরা সকলেই ঘুমে কাদা। একদিকে চার বছরের গ্রেস আর তিন বছরের মায়ী জড়াজড়ি করে শুয়ে আছে, অন্যদিকে প্রায় এক বছরের কেইটি, দুই হাত নিতাই-গৌরাঙ্গের মত তুলে ঘুমাচ্ছে। মাঝখানে আমিই শুয়েছিলাম, চোখ কচলাতে কচলাতে সেখান থেকেই নামলাম, আমার শোয়ার পাজামার কোমরের ইলাস্টিকটা ঠিক করতে করতে। অন্য দিন হলে ঘাড়টার দিকে এই সময় তাকানোর কোন প্রয়োজনই হতো না। কিন্তু আজ তো আমার তাড়া, আজ আমার সকাল এগারোটায় নিউ-ইয়র্ক স্টেটের রচেস্টার শহরে যাবার প্লেন ধরতে হবে, ওখানকার 'কোডাক' কোম্পানিতে কাল সকালে একটা ইন্টারভিউ আছে। ক্যালিফোর্নিয়ার সান-ফ্রান্সিস্কো থেকে আমি যাব ওয়াশিংটন ডি.সি.-র ডুলাস এয়ারপোর্টে, সেখান থেকে নিউ-ইয়র্ক স্টেটের নিউ-ইয়র্ক শহরের জে.এফ.কে. এয়ারপোর্টে, আর তারপর সেখান থেকে রচেস্টারে।

বছর খানেক আগেও এই সময়টা ছিল একান্তই আমাদের, মেয়েরা ঘুমাচ্ছে বলে! দিনের শেষে কাজ থেকে ফিরে তো একজনের আর একজনের দিকে তাকানোরই সময় হয় না; ডে-কেয়ার থেকে তুলে তিন মেয়েকে চান করানো, তাদের বায়নারা সামলানো, সাপার বানানো, আর তারপর তাদের খাইয়ে, ঘুম পাড়িয়ে কোনও রকমে হয়ত একটু টিভি দেখা আর তারপর নিজেদের শুতে যাওয়া। তাছাড়া প্রায়ই আমাদের দুজনেরই কিছু না কিছু কাজ অফিস থেকে বাড়ি বয়ে নিয়ে আসতে হয়, যেমন আমার 'খাতা-দেখা', ওর 'জার্নাল-পড়া' ইত্যাদি। সেইসব রাতে টিভি দেখাটাও লাটে! তাই দিনের শুরুতেই যা সম্ভব, মেয়েরা যখন ঘুমাচ্ছে! কিন্তু আজকাল সেসব চুলোয় গেছে। এই তো, মাস কয়েক আগেও আমাকে 'হাগ' না কোরে ও কাজে বেড়ত না। কিন্তু সেসব অনেক দিন আগেই চুকেবুকে গেছে। এখন আমাদের সম্পর্কটা এই ঠেলায় এসেই ঠেকেছে; সকালে কয়েকটা গুঁতো, নতুবা সন্ধ্যাবেলা 'দিনার-টেবিলে' "উড ইউ পাস মি দা ফুড প্লিস?" ব্যাস।

গ্রেস আর মায়ীকে আজকাল চোখে চোখে রাখতে হয়, না হলে দরজা খোলার সুযোগ পেলেই ওরা বাইরে বেরিয়ে যেতে চায়, সামনের বাগানটায়। শুধু বাগানে হলে অত চিন্তার কিছু ছিল না। কিন্তু বাগানের পরেই যে রাস্তা, 'বাওয়ান্স অ্যাভিনিউ', সেখানে গাড়িঘোড়া; বাগানের গোলাপ-গাছগুলোতেও অনেক কাঁটা। এই চিন্তাগুলো না থাকলে ও হয়ত আমাকে আর গুঁতোটাও মারত না। হাই তুলতে তুলতে ওর পেছন পেছন গেলাম, দরজায় খিল দেব বলে। ওকে মনে করিয়ে দেবার চেষ্টা করলাম যে আজ বিকেলে তো আর আমি থাকব না, ও যেন মেয়েদের ডে-কেয়ার থেকে সময়মত তুলে নেয়। কাল আমার ফিরতে ফিরতেও তো সেই সন্ধ্যা, ঠিকঠাক যেন সব 'ম্যানেজ' করে নেয়। শুনতে পেল কি পেলনা তা ঠিক বুঝলাম না, না কি হয়ত গা-ই করল না; কারণ ও ফিরেও তাকাল না। বেড-রুমের কাপেট পেরিয়ে, লিভিং-রুমের হার্ড-উড ফ্লোরে হাই-হীল জুতোয় টক টক আওয়াজ তুলে, গট গট করে হেঁটে ও বেরিয়ে গেল গ্যারাজের উদ্দেশ্যে। বড্ড কানে লাগল আওয়াজটা। ফ্লোর তো নয়, যেন আমার মাথার ওপরেই কয়েকটা বাড়ি মেরে গেল ওর জুতোর ঐ হীলদুটো দিয়ে!

এই তো হয়েছে আজকাল আমাদের রুটিন। ও খুব সকালেই কাজে বেরিয়ে যায়। ওকে যেতে হয় সেই সান-ফ্রান্সিস্কো এয়ারপোর্টের পাশে, বার্লিংগমে। ওখানেই ওর অফিস। সকাল সকাল না বেরলে 'রাশ আওয়ারে' এতো ট্র্যাফিক-জ্যাম হয় ওদিকটায় যে আট লেইনের ফ্রিওয়েতেও গাড়ি থৈ থৈ; আমাদের সান্টা-ক্রারার বাড়ি থেকে তিরিশ মিনিটের পথ যেতেই দেড় ঘণ্টা

লেগে যায়। একটু সকাল সকাল বেরলে 'সেই ট্র্যাফিকটা'কে এড়ান যায়। আমার সেই চিন্তা নেই। আমার কাজ কাছের, উল্টোদিকে সান-হোসেতে। ওখানেই এক ইউনিভার্সিটিতে পড়াই আমি। আমার জার্নি ট্র্যাফিক জ্যামের উল্টো মুখে বলে কাজে যেতে বিশেষ সময় লাগে না। তাই সকালে লিভা আগে আগে বেরোয়। পরে আমি বাচ্চাদের ঘুম থেকে তুলে, ব্রেকফাস্ট খাইয়ে, রেডি করে, ডে-কেয়ারে নামিয়ে তারপর কাজে যাই। দিনের শেষে ট্র্যাফিক জ্যামের ব্যাপারটা আবার ঠিক উল্টো বলে লিভাই কাজ থেকে ফেরার পথে মেয়েদের ডে-কেয়ার থেকে তুলে বাড়ি আনে। এতে ডে-কেয়ারের কস্ট একটু শাসয় হয়। আর আমি সারাদিন ছাত্র-ছাত্রী 'গ্যাপানর' পর সন্ধ্যাবেলার রাশ আওয়ারের ট্র্যাফিক-জ্যাম 'ঠেঙিয়ে' সরাসরি বাড়ি ফিরি, বেশ সময় লাগে।

কিন্তু আজকাল আর বাড়ি ফিরতে তেমন ইচ্ছা করে না, সঙ্কেচ হয়। বাড়ি ফিরলেই তো নানান অভিযোগ। তার সাথে সিগারেটের ধোঁয়া, মদের গন্ধ, নানান রকম ওষুধ-বিসুধ - এইসব মাত্রা ছাড়িয়ে বেড়েই চলেছে। এগুলো আগেও ছিল, তবে বাড়াবাড়িটা শুরু হয়েছে প্রায় বছরখানেক হোল; আমি আগে যেখানে কাজ করতাম, সেই 'অক্সফোর্ড মলিকুলার' কোম্পানি লাটে ওঠার পর থেকেই, যখন 'সিলিকন ভ্যালি'র 'বাবল-বাস্টে' আমার কোম্পানিও সামিল হল। এমনিতে আমার এই পড়ানোর চাকরীটা খারাপ লাগছে না। কিন্তু মুশ্কিল হয়েছে এই যে এটা লিভার ঠিক পছন্দ নয়। আমার ইউনিভার্সিটির মাইনেটা নাকি ঠিক আমার যোগ্যতা অনুযায়ী যথেষ্ট নয়, লিভার আশানুরূপও নয়। তা ঠিক, এই চাকরীর মাইনেটা আমার আগের চাকরীর তুলনায় সত্যিই অনেক কম, লিভার চাকরীটা না থাকলে আমাদের এই ঠাটবাট বজায় রাখার কোন প্রশ্নই উঠত না। অথচ পরিবারটাকে মিনেসোটা থেকে ক্যালিফোর্নিয়ায় এনেছিলাম তো আমিই, আমার আগের চাকরীটার ওপর নির্ভর করেই। তখন আমার রমরমা ছিল, আমার কাজের ভরসাতেই ও ওর মিনেসোটার 'ল্যাব-ম্যানেজারের' চাকরীটা ছেড়ে আমার কাছে ক্যালিফোর্নিয়ায় চলে এসেছিল। শুধু আমার চাকরীতেই সান-ফ্রান্সিস্কোর মত জায়গায় 'মুত' করার ৬ মাসের মধ্যেই আমরা একটা 'সিঙ্গল-ফ্যামিলি' বাড়ি কিনতে সক্ষম হয়েছিলাম। মিনেসোটায় ওর পরিবারের অনেকেই এসব দেখে একেবারে 'হা' হয়ে গিয়েছিল। মুখে কিছু না বললেও ও যে এসব তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছে তা আমি বুঝতে পারতাম। হপ্তা-অন্তর ওর হেয়ার-ডু পাল্টান আর পেডিকিওর-ফেসিয়ালে তার একটা বহিঃপ্রকাশও ছিল। আমার বৌয়ের মুখের চামড়ায় একটা জেঞ্জা এসেছে, দেখে আমারও ভালো লাগত বৈ কি! আমার শুধু একটাই আক্ষেপ ছিল; বাবা বেঁচে থাকতে থাকতে এসব হলে কি ভালোই যে হত! কিন্তু সে দিন আর বেশিদিন টিকল না। 'অক্সফোর্ড মলিকুলার' কোম্পানির সাথেই কোথায় যেন হারিয়ে গেল।

এখন লিভার কাজ না করলেই নয়, বাড়ির 'মটগেজ', গাড়ি দুটোর 'পেইমেন্টস', আনুসঙ্গিক ইন্সুরেন্স কস্টস, আমাদের লাইফ-ইন্সুরেন্স, হেলথ-ইন্সুরেন্স, পারিবারিক অন্যান্য খরচ- এইসব তো আর উবে যাবে না। আর উঠতে বসতে এই ব্যাপারেই কথা শোনায় ও আমাকে আজকাল। ওর ধারণা যে আমি ওর বাড়ি এসে জুটেছি; ওর ঘাড়ে বসে ওর পয়সাতেই খাচ্ছি। আমার পরিবারকে ফোন করে আমি নাকি 'ইন্টারন্যাশনাল লং-ডিষ্টেন্স' একটু বেশীক্ষণ ধরে কথা বলি, তাতে অনেক খরচ। সে খরচ যোগাবার মুরদ আছে আমার? আর তাঁদেরকে ফোন করাই বা কেন? তারা কি কোনও দিন একটা বার্থ-ডে কার্ডও পাঠিয়েছে আমাদের মেয়েদের? তাছাড়া আমাদের বিয়েতে বাধা দিয়ে ওঁরা যেসব কথাবার্তা বলেছিলেন, সেগুলো কি এতো সহজেই ভুলে যাবে ও? 'Holy cow'-এর ব্যাপারটাতো ও আগে থেকেই জানত, আর তারপর ভারতে গিয়েও তো স্বচক্ষে দেখেই এসেছে যে কোন জায়গার 'মাল' আমি, কোলকাতার রাস্তায় ঘেয়ো-কুকুর আর বহরমপুরের রাস্তায় ডেইনের-খিঁচ মাখা শুরোর, টয়লেট-পেপার 'খায় না মাথায় দেয়?', কাজের লোক ঘর-বাড়ি বাঁট দিয়ে নোংরা ফেলে রাস্তায় আবার সেই নোংরাই হাওয়ায় উড়ে এসে

দেকে ঘরে! আমার সব কিছুই নাকি একটা 'ইভিল-সাইকেল'। এইসব আগে জানলে.....। কী বা আর আশা করা যায় আমার কাছ থেকে? গাধাকে পিটিয়ে কি আর ঘোড়া বানানো যায়? আমার 'পেরেকিং-স্টাইল'ও নাকি ঠিক না, আমি নাকি 'ইনকনসিসটেন্ট'; এতে মেয়েদের ক্ষতি হচ্ছে। নিজেদের ঘর-বিছানা থাকতে বাপ-মায়ের খাটে এসে শোবে কেন ওরা? এতে নাকি 'আমাদের প্রাইভেসি' থাকছে না, আর ওদেরও অভ্যেস খারাপ হয়ে যাচ্ছে। এখন থেকেই না শিখলে অন্যের প্রাইভেসিকে 'রেস্পেক্ট' করা, স্বনির্ভরতা এইসব শিখবে কি করে ওরা? মায়ের সাথে এক খাটে শুয়ে বড় হয়েই তো আমার নাকি এই অবস্থা; ওকে ছাড়া আমার চলেই না, ঐ জন্য ওর পেছনে সর্বদা ঘুরঘুর করি আমি, আমি নাকি ওর ওপর 'ইমোসোনালি-ডিপেন্ডেন্ট'। আমাদের মেয়েদের ক্ষেত্রেও এটা ঘটুক তা একেবারেই চায় না ও। আমি বললাম রাখো তোমার ঐ 'স্বনির্ভরতা'; দেখতেই তো পাচ্ছি চারদিকে, grade-9, 10 থেকেই বাচ্চাগুলো সব পকেটে কনডম নিয়ে ঘুরে বেড়ায় - দেখলেই মনে হয় যে এক রদ্যায় মাথাটা ঘাড় থেকে আলাদা করে দি; দরকার নেই আমার ঐ ঘোড়ার-ডিমের 'স্বনির্ভরতা'। রদ্যাটা যেন ওর ঘাড়ে গিয়েই পড়ল, কারণ কথাটা শুনে ও যেন একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল! এর ওপর যোগ হয়েছে হঠাৎ আমার এই ভারতীয়-বাঙালি হবার বাসনা, এই সান-ফ্রান্সিস্কোয় আসার পর থেকে। এখানকার ভারতীয় দোকানপাট দেখে আমার নাকি মাথা ঘুরে গেছে! এইসব অপ্রয়োজনীয় ভারতীয় খাবার-দাবার কেনা, মেয়েদের অপ্রয়োজনীয় ভারতীয় জামাকাপড় কিনে দেওয়া, এইসবের একটা 'এক্সট্রা' খরচ নেই? তা যোগাবে কে? সংসারের খরচ চালানোর পর হাতে আর আমাদের থাকে কিছু? এইসব আমি জানি না? তারও ওপর আমি নাকি ওর স্বাধীনতাতেও হস্তক্ষেপ করছি; ও কত 'ড্রিঙ্ক' বা 'স্মোক' করবে, সেইসবে আমি বাধা দেবার কে? নিজেতো 'সোসালাইজ' করতে জানিই না, উল্টে ওর 'সোসালাইজেশনে'ও আমি বাধা দেবার কে? আমার আবার 'সোসালাইজেশনে'র যা ছিри; বাড়ি বয়ে লোক ডেকে এনে এক থালা ভাত খাওয়াও! তাদের নাকি কেউ হাঁ করে হাঁচে, কেউ হাঁ করে চিবোয়, কেউ বা আবার হাতে ভাতের দলা পাকিয়ে 'লোপ্লা' করে মুখে ছোঁড়ে! দেখে নাকি ওর সারা শরীর রি-রি করে, গা-পিক্তি একেবারে জ্বলে যায়। ওর 'কমপ্লেইন্টসে'র লিস্টটা যেন আর শেষই হতে চায় না। মুস্কিল হল এই যে ওর বেশীর ভাগ 'কমপ্লেইন্টস' গুলোর মানেই আমি বুঝতে পারি না, তা সংশোধন করা তো দূরের কথা! শুধু বলেছিলাম যে মেয়েরা ওদের ঘরে একা একা শুতে ভয় পায়, ওরা শুক না আরও কিছুদিন আমাদের বিছানায়, তারপর না হয়.....। সেটা ওর পছন্দ হল না। আমার মতন ওর তো আর 'সুখের চাকরী' না যে একই 'ফর্মুলা' আর 'ইকুয়েসান' বছর বছর পড়িয়ে যাওয়া, ওর 'বায়োটেক' - হগ্গাহ অন্তর 'নিউ-রিসার্চ ফাইন্ডিংস' নিয়ে ওকে 'ডিল' করতে হয়; ওকে নাকি প্রতি মিনিটেই কনসেনট্রেট করতে হয়, সারাদিন কাজ করতে গেলে ওর নাকি রাত্তিরে ভালো ঘুমের দরকার, একটু 'পার্সোনাল স্পেস' দরকার!

অগত্যা আজকাল আলাদা হয়ে গেছি আমরা, এক ছাদের তলায় থেকেও। কবে যে শেষ আমরা এক খাটে শুয়েছি তা আর মনে করতে পারি না। আমাদের 'মাস্টার বেডরুমের' বড় খাটটায় আমিই শুই, আমাদের তিন মেয়েকে নিয়ে, আর ও শোয় 'গেস্ট-রুমের' 'স্পেয়ার-বেড'টায়। মেয়েদের ঘর, বিছানাগুলো সব খালিই পরে থাকে। ডিনার টেবিলেই একটু দেখা-সাক্ষাত বা কথাবার্তা হয় ওর সাথে, না হলে সেই ভোরবেলায় দরজায় খিল দিতে গিয়ে। ভাগিস আমার হাতে রান্না করা 'ইন্ডিয়ান-ফুড' এখনও পছন্দ ওর। আজকাল আর কিছু বলতে সাহস পাই না, জানি তাতে ওর 'ড্রিঙ্কিং'র মাত্রাটা শুধুই বাড়বে। তাই চুপ করে থাকি। আমারইতো যত দোষ। ও তো আর আমার দেশে যায়নি, আমিই এসেছি ওর দেশে; আমারই নিজেকে পাল্টানো দরকার, ওর ভাব-ধারার সাথে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া দরকার। চেষ্টা তো করেই চলেছি, কিন্তু কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না। তবুও সুযোগ পেলেই এই কথাগুলো ও আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয় একবার করে। কি হচ্ছে না, কেন হচ্ছে না, এইসব আমি ছাড়া ওর থেকে ভালো আর কেউই জানে না, তবুও খোঁটাটাও আসে ওর কাছ থেকেই সবচেয়ে বেশি!

আরও আছে, মিনেসোটা ওর বাড়ির লোকজন। সুযোগ পেলেই তাঁরা আমাকে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেন যে আমি নাকি "did not mount up to potential"। বৌ বাড়ি বসে পায়ের ওপর পা তুলে খাবে, নিত্য হেয়ার-ডু পাল্টাবে, ম্যানিকিওর-পেডিকিওর আর ফেসিয়ালের ছড়াছড়ি থাকবে, হরদম গাড়ি পাল্টান হবে - এইসব

না হলে কি আর একটা পি.এইচ.ডি.-হাসব্যান্ডের পোটেনশিয়ালে 'রিচ' করা হয়? এক এক সময় মনে হয় যে লিভা আমাকে বিয়ে করেনি, ও বিয়ে করেছিল একটা ডক্টরেট-কেমিস্টের 'পোটেনশিয়াল' রোজগারকে; ওর পরিবার আদৌ মেনে নেয়নি তাঁদের সাদা মেয়ের এক ভারতীয়কে বিয়ে করা, তাঁরা শুধু মেনে নিয়েছিলেন এই যে সেই ভারতীয় হয়ত তার 'পি.এইচ.ডি.-ইন-কেমিস্ট্রি'-র ডিগ্রীটা আর রোজগার-পাতি দিয়ে তাঁদের পরিবারের অন্যান্যদের চুপ করিয়ে দেবে। সেইসব ঠিকঠাক না হওয়াতেই যত বিপত্তি। একবার কথায় কথায় বলেছিলাম যে আর কয়েকদিনের মধ্যে মনের মত একটা চাকরী না পেলে ডাক্তারি পড়ব ভাবছি, শুনে ও একেবারে ফোঁস করে উঠল। আরও একটা অদ্ভুত কথা শুনলাম সেদিন, ওর কানে আমার শাশুড়ি-মার 'ফুসমন্তর'; আমি নাকি ওকে আর আমাদের তিন মেয়েকে ওর মিনেসোটার পরিবারের থেকে অনেক দূরে রেখে ওদের 'আলাদা' করে দিতে চাইছি। তা না হলে কি দরকার আছে এই ক্যালিফোর্নিয়ায় পড়ে থাকার?

খুবই একা আর অসহায় লাগে, নিজেকে বড় ছোট মনে হয়; কিন্তু কি যে করবো তা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। এইসব নিয়ে কারও সাথে কথা বলে কোনো উপদেশ নেব কিনা তাও ঠিক বুঝতে পারছি না। বাড়িতে কারো সাথে এইসব ব্যাপারে কথা বলার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না। ওরা বুঝবেও না, উপরন্তু ওঁদের নিষেধ অগ্রাহ্য করে বিয়ে করেছিলাম বলে আমায় অন্যরকম খারাপ কিছুই বলবে, আমার সেটাই দৃঢ় বিশ্বাস। দু-একবার যে চেষ্টা করিনি তা নয়, কিন্তু মদ-মাতলামি এইসবকে ওরা 'নোংরামি' আখ্যা দিয়ে আলোচনাটাকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেয়; তাই দেশের কারো সাথেই এই নিয়ে কথা বলতে ইচ্ছা করে না - ওরা ঠিক বোঝে না। বন্ধু-বান্ধব যে দু-একজনের সাথে এই ব্যাপারে কথা বলা যায় বলে আমার মনে হয়, তাদেরকেও বলব বলব করেও কিছু বলতে পারি না; লজ্জা, ভয়, অহংকার, সঙ্কোচ - সব একসাথে মনে এসে ভিড় করে। আবার মনে হয়, কেনই বা কষ্ট দেব নিজের বৌকে, ওর সম্পর্কে খারাপ কথা বলে? সেটা কি ঠিক? আমার বন্ধুরাতো ওরও বন্ধু, ওর সম্পর্কে খারাপ কিছু বললে আমার বন্ধুদেরও খারাপ লাগবে, আর ও এসব জানতে পারলে শুধু দুঃখই পাবে। নিজের বউকে জেনে-বুঝে দুঃখ দেওয়াটা কি ঠিক? থুথুটা ওপর দিকে ছেঁতলে তা তো নিজের গায়ে এসেই পড়ে! গুমরে মরি - নিজেকে নিজেই 'স্টোকবাক্য' শুনাই, হয়ত ঠিকাই; যে আর কিছুদিনের মধ্যেই তো সব ঠিকই হয়ে যাবে!

কিন্তু কোনো কিছুই ঠিক পথে এগচ্ছে না। বাড়িতে ওর জন্য স্লিপিং-পিল, অ্যানটাই-ডিপ্রেসেন্ট, 'প্রেক্সিপ্লান' আর 'ওভার-দা-কাউন্টার' মেডিকেশান যেন মুড়ি-মুরকি হয়ে গেছে; আর অ্যালকোহলতো আছেই, ওর 'বেস্ট-ফ্রেন্ড'! কিন্তু এইসবের কোনোটারই কোনও সুফল আমি দেখতে পাচ্ছি না, একমাত্র ঐ অ্যালকোহলের কুফলটা ছাড়া; অনেক চেষ্টা করেও ওর চাহিদার সাথে আমি ঠিক এঁটে উঠতে পারছি না। বাড়িতে সিগারেটের ধোঁয়ায় আমার দম বন্ধ হয়ে আসে, ভকভকান অ্যালকোহলের গন্ধে আমার বমি আসে, আর এইসব প্রত্যক্ষ করে করে প্রাণ আমার ওষ্ঠাগত, বিশেষত মেয়ে তিনটির ওপর এইসবের কু-প্রভাব দেখে; জীবনটাকে দুর্বিসহ লাগে - একটু হাঁপিয়ে গেছি। একটা সুস্থ-মানুষ যে কি করে এত ওষুধ গপাগপ গিলতে পারে আর তারপরেও অ্যালকোহলের প্রয়োজনীয়তা বোধ করতে পারে তা আমি বুঝে উঠতে পারি না। আমি তিন মেয়েকে নিয়ে রাত্তিরে দিব্যি ঘুমাই, দরকার হলে মাঝ রাত্তিরে ঘুম থেকে উঠে কেইটিকে খাওয়াই, ওর ডাইপার বদলাই; কখনো 'টায়ার্ড ফিল' করি না। 'টায়ার্ড ফিল' করি ওর এই অ্যালকোহল আর ওষুধগুলোর সাথে লড়তে গিয়ে, শারীরিকভাবে নয়, মানসিকভাবে; কিন্তু মাঝে মাঝেই তার প্রভাব শরীরের ওপরেও এসে পরে বৈ কি! এই লড়াইটা যে আমি ক্রমশই হেরে যাচ্ছি তা আমি বুঝতে পারছি, কিন্তু কি যে করণীও সেটা আর বুঝে উঠতে পারছি না। আরও হাজার কয়েক ডলার বেশি রোজগার করতে পারলে হয়ত কিছু সমস্যার সমাধান হয়, এই মনে করেই এই 'কোডাক' কোম্পানিতে দরখাস্ত করেছিলাম। দেখি, এতে যদি আমাদের সম্পর্কের উন্নতিতে কোন সুরাহা হয়! সুবিধা হল এই যে এই চাকরীটা পেলে আমাদের 'মুভ' করতে হবে না, কোডাক ওদের এই 'ওয়েস্ট কোস্টে'র অফিসেরই এক 'জোনাল ম্যানেজার' খুঁজছে - কোয়ালিফায়েড, ইয়াং, এনার্জেটিক, আর উইলিং-টু-ট্রাভেল! এই হাঁপানো শরীরে 'এনার্জি'র আর তেমন কিছুই অবশিষ্ট নেই, শুধু বাকী তিনটির ওপর ভরসা করেই এদিককার জোনাল-অফিসের ইন্টারভিউটায় উৎরে গেছি; এবার ডাক পড়েছে ওদের 'হেড অফিসে',

ঐ রচেস্টারে।

এই ইন্টারভিউয়ের ডাকটা পেয়ে যেন একটা আশার আলো দেখতে পেয়েছি - একাডেমিয়ার থেকে ইন্ডাস্ট্রিতে যে মাইনে বেশি! এই কাজটা আমি পেলে লিডকে আর কাজ করতে হবে না; ও আবার বাড়িতেই থাকতে পারবে, ও আর মদ খাবে না - সেটাই আমার আশা। সেই আশাতে বুক বেঁধেই আজ ওর পেছন পেছন সদর-দরজা পর্যন্ত এসেছিলাম, বিকেলে আমি থাকব না তা স্বরণ করিয়ে দিয়ে, ওকে কয়েক সেকেন্ডের জন্য হলেও একবার আটকাতে চেষ্টা করেছিলাম; অন্তত একটা হাগও যদি আদায় করা যায় - তা আর হল না। গ্যারাজ থেকে ওর গাড়িটা রিভার্সে বার করে ও চলে গেল। গ্যারাজের অটোম্যাটিক দরজাটা ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজে ঘরঘর করে নিচে নেমে এল আমার চোখের সামনে, গ্যারাজটাকে আবার অন্ধকার করে দিয়ে। ঐ অন্ধকারেই দাঁড়িয়ে থাকলাম খানিকক্ষন। ঐ ভাবে দাঁড়িয়েই মনে মনে একটা প্ল্যান করে নিলাম যে বাচ্চাদের কি ভাবে রেডি করে, কখন ডে-কেয়ারে নামিয়ে, কখন আমার এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া উচিত।

বাচ্চাদের এই ঘুম থেকে তোলার সময়টা আমার কাছে বেশ মজার। অনেক সময়ই ওদের ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে ওদের পাশে চুপটি করে বসে থাকি আমি, দেখি যে ওরা ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই ওদের মুখের বিভিন্ন পেশী সঞ্চালন করে কত রকম অঙ্গভঙ্গি করে। দেখে কেমন যেন মায়া লাগে, ওদেরকে দেব-তুল্য মনে হয়, সময়টাকে কেমন যেন স্বর্গীয় বলে মনে হয়। এমন সরল, এমন নিস্পাপ দৃশ্যের দর্শন বোধহয় আর কোথাও সম্ভব নয়। ওরা কখনো হাসে, কখনো বা ডুকরে কেঁদে ওঠে; বোধহয় স্বপ্ন দেখে। কখনো কখনো আমি সেইসব অঙ্গভঙ্গির ছবি তুলি। তারপর ক্যামেরার শাটারের শব্দে ওদের ঘুম ভেঙ্গে যায়। পরে ব্রেকফাস্ট-টেবিলে সেইসব ছবি আমি, গ্রেস, আর মায়া একসাথে দেখি, দেখে সবাই একসাথে হাসি; আর কেইটি শুধুই আমাদের মুখ চাওয়া-চায়ি করে, হয়ত ভাবে যে এইসব হচ্ছেটা কি? ওরা জোর করে আবার সেইসব অঙ্গভঙ্গি করার চেষ্টা করে - খুব মজা হয়। গ্রেসকে তুলি তো মায়া আবার শুয়ে পড়ে, আবার মায়াকে তুলি তো গ্রেস আবার শুয়ে পড়ে ওর ছোট্ট মুখটা ওর ছোট্ট 'লিটল-মারমেইড ব্ল্যাক্স' দিয়ে ঢেকে দেয়, 'পিক-আ-বু' খেলে; ভাবে যে ওকে বোধহয় আমি আর খুঁজেই পাব না। কেইটির দিকেও নজর রাখতে হয়, না হোলেই তো খাট থেকে গাড়িয়ে পড়ে এক কেলেঙ্কারি হবে! আজ আর সেইসবের সময় হল না। তাড়াতাড়ি তৈরি করে ওদের ডে-কেয়ারে নিয়ে গেলাম।

ডে-কেয়ারের লেডি 'সুসানা ভিডেলা' আগে থেকেই জানত যে আজ আমি নিউ-ইয়র্ক যাব। আমার গাড়িটা ওর 'ড্রাইভওয়ে'তে পার্ক করতেই ও ওর বাড়ির দরজা খুলে এগিয়ে এল, কি যেন একটা বলতে; এমনিতেতো সচরাচর ও ওর সদর-দরজায় দাঁড়িয়েই আমাদের "ওলা" বা "আস্তা মানিয়ানা" বলে! ভাবলাম আজ আমি নিউ-ইয়র্ক চলে যাচ্ছি বলেই হয়ত এই খাতির! বাচ্চাদের ওর কাছে গচ্ছিত করতে করতেই ওকে মনে করিয়ে দিলাম সেই ব্যাপারে, যে কোন এমারজেন্সি হলে ও যেন লিডকেই ফোন করে, আমি তো থাকব না। ও আমাকে হাত নেড়ে কিছু একটা বোঝাতে চাইল। ও আর্জেন্টিনার মানুষ। যদিও অ্যামেরিকাতে আছে অনেক দিন, ইংরেজি ভাষাটা রঙ করতে পারেনি। এখনও স্প্যানিশ ভাষাতেই কাজ চালায়। স্প্যানিশ ভাষায় আবার আমার জ্ঞান অতি নগণ্য। আমি শুধু বার কয়েক 'নিউ-ইয়র্ক' কথাটাই ওর মুখ থেকে শুনে বুঝতে পারলাম। ঠিকই তো, নিউ-ইয়র্কেই তো যাচ্ছি, এই মনে করে প্রথমে ওকে অবজ্ঞা করে নিজের ড্রাইভার'স সীটের দিকেই এগিচ্ছিলাম, তাড়া আছে না! কিন্তু দেখলাম যে 'সুসানা' আমাকে কিছু একটা বলার জন্য নাছোড়বান্দা। তাই আবার ওর কাছেই ফেরত এলাম, ভাবলাম দেখিই না, কি এমন কথা বলতে চায় ও আমাকে?

সুসানা হয়তো ততক্ষণে বুঝে গেছে যে ওর স্প্যানিশ ভাষা আমি ঠিকঠাক বুঝে উঠতে পারছি না। তাই হাত নেড়ে ও আমায় ভেতরে ডাকল, আর তারপর আঙুল দেখিয়ে টিভি দেখার নির্দেশ দিল। স্প্যানিশ ভাষার চ্যানেল হোলেও আমার বুঝতে অসুবিধা হল না যে নিউ-ইয়র্কে ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটে গেছে! সুসানাকে চ্যানেলটা ইংরেজি ভাষায় পাল্টাতে অনুরোধ করলাম। দেখি টুইন-টাওয়ারের একটা টাওয়ার জ্বলছে দাউ দাউ করে। সর্বনাশ! লাইভ টেলিকাস্টে বলছে যে জে.এফ.কে এয়ারপোর্ট থেকে টেক-অফ করা পুরো একটা প্লেনই নাকি ঢুকে পড়েছে এই টাওয়ারটার মধ্যে, এটা নাকি কোনো 'অ্যাকসিডেন্ট' নয়, এটা একটা জঙ্গি-নাশকতা।

নিজের চোখে দেখে বিশ্বাসই করতে পারলাম না। এমনটা আবার হতে পারে নাকি? খোদ অ্যামেরিকার মাটিতে নাশকতা? আমাদের এই 'স্টেট-অফ-দা-আর্ট' সিকিউরিটিকে ধোঁকা দিয়ে? হতেই পারে না, আমি বিশ্বাস করি না। এই দুনিয়ায় কার ঘাড়ে এমন মাথা থাকতে পারে?

তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এলাম। এসে দেখি আমার ট্যাক্সি এসে হাজির, আমাকে এয়ারপোর্টে নিয়ে যাবার জন্য; ট্যাক্সির বুকিং আগে থেকেই করা ছিল। সুসানার ডে-কেয়ারে টিভি দেখতে গিয়ে আমিই দেরি করে ফেলেছি। গাড়িটা তাড়াতাড়ি গ্যারেজে ঢুকিয়ে বাড়ির ভেতরে ছুটলাম। ডাফেল-ব্যাগটা রেডিই ছিল। জামাকাপড়টা বদলাতে বদলাতে ঘরের টিভিটা চাললাম। আর দ্বিতীয় টাওয়ারটায় প্লেনের ধাক্কা মারাটা দেখলাম - 'লাইভ'। মনে মনে এতক্ষণ একটা প্রশ্ন ছিলই, যে প্রথম টাওয়ারে প্লেন ঢুকে পরাটা কি সত্যিই কোন জঙ্গি-নাশকতা নাকি তা রিপোর্টারদের শুধুই একটা বাড়াবাড়ি; হতেও তো পারে যে এটা নেহাতই একটা 'অ্যাকসিডেন্ট'! দ্বিতীয় টাওয়ারে প্লেনের ধাক্কা মারাটা দেখার পর মনে আর কোনো সন্দেহের অবকাশই রইল না। টিভিতে আরও কি কি সব বলছে; পেটাগনেও নাকি একটা প্লেন আছড়ে পড়েছে! কিন্তু এইসব দেখে আর দেরি করা যাবে না, তাহলে নিজের ফ্লাইটটাই মিস করবো। মাথায় এক রাশ চিন্তা নিয়ে ট্যাক্সিতে উঠে পরলাম এয়ারপোর্টে যাবার উদ্দেশ্যে।



এয়ারপোর্টে গিয়ে দেখি আমার ফ্লাইটের ব্যাপারে কোনও খবর নেই। বসন্ত কোনো ফ্লাইটের ব্যাপারেই কোনও খবর নেই। এয়ারলাইনের কাউকে কিছু জিজ্ঞাস করলে কেউ কিছু বলছে না। সবাই যেন মুখে কুলুপ এঁটেছে। অন্যান্য যাত্রীদের কাছ থেকে কানাঘুষো শুনলাম অনেক কিছুই; কেউ বলল যে আজ সকালের সব ফ্লাইট বাতিল, কেউ বলল শুধু দুপুরের গুলো, কেউ বলল সারা দিনের, আবার কেউ বলল সারা সপ্তাহের। এমনটা আবার হয় নাকি? প্রায় হাজার খানেক প্লেন রোজ ওঠা-নামা করে এই এয়ারপোর্টে! তার সবই.....? তা কি করে হতে পারে? কী যে বিশ্বাস করবো, আর কাকেই যে বা বিশ্বাস করবো তার কিছুই বুঝে উঠতে পারলাম না। মুশকিল হল এই যে যাদের কথা বিশ্বাস করা যায়, তাদের কেউই কিছু বলছে না। তা হোক, আবার ফেরত গেলাম এয়ারলাইনের কাউন্টারটায়। অ্যাটেনডেন্টসগুলোকে বোঝানার চেষ্টা করলাম যে আমার কাছে লুকানোর কিছুই নেই; আমি সবই বাড়িতে টিভিতে দেখেই এসেছি, নতুন করে ভয় পাওয়ানোর মত কোনো খবরই ওরা আমায় দিতে পারবে না - তবুও ওদের কারো মুখ থেকেই কিছু বার করতে পারলাম না। ওরা শুধু বলল যে আমার নির্দিষ্ট ফ্লাইটটা নাকি "ডিলেইড বাই আনসারটেইন পিরিয়ড অফ টাইম"। "আনসারটেইন"? এ আবার কেমন কথা? এত জায়গায় 'ট্রাভেল' করি, কই কোনদিন তো এমনটা শুনিনি! তাও আবার খোদ সান-ফ্রান্সিস্কো ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে? ভীষণ বিরক্ত লাগল। খেয়াল করলাম যে এয়ারপোর্টের 'মনিটর'গুলোও সব অকেজো। নাকি ইচ্ছা করেই 'সুইচ-অফ' করে দেওয়া হয়েছে? বাইরের কোনও খবরই পাওয়া যাচ্ছে না। এয়ারপোর্টেরই একটা কাফেতে গেলাম, যদি সেখানকার টিভিগুলো থেকে কিছু জানা যায়। সেখানেও একই অচলাবস্থা। কাফেতে কফি, পেস্ট্রি সবই 'চলছে', শুধু টিভিগুলো ছাড়া। আমার এই এগারো বছরের অ্যামেরিকান জীবনে এমন অচল অবস্থা কোথাও কোনদিন দেখিনি, অ্যামেরিকাতে যে এমনটা হতে পারে সেটাই বিশ্বাস হচ্ছিল না। ঘড়ি-ধরে, নিয়ম-মাফিক সব কাজ হয় এখানে, এমনটাই তো জানতাম এতদিন!

অগত্যা ভাবলাম যে লিভাকে একটা ফোন করি। ও যদি কিছু বলতে পারে। ফোন ধরে ও বলল যে ও পুরোটাই দেখছে ওর অফিসের টিভিতে, লাইভ; কাজকর্ম সব লাটে! তারপর বলল “ইস, টাইমিংটা আর একটু এদিক-ওদিক হলেই তো তুমি নিউ-ইয়র্কে থাকতে, তাই না!” না থাকতে ও খুশি না অখুশি, বা এটা আদৌ ওর কাছে কোন ব্যাপার কি না; তা বুঝতে পারলাম না। ওর কথা শুনে শুধু মনে হল যে ঐ ধংস হওয়া প্লেন-তিনটির একটায় আমিও থাকতে পারতাম।

এয়ারপোর্টের ভাব-গতিক দেখে বুঝে গেলাম যে আজ আর কোন প্লেন এখান থেকে উড়বে না! তাই একটা ট্যাক্সি ডেকে বাড়ির পথে রওনা হলাম। ট্যাক্সির পেছনের সিটায় বসে টাইটা একটু আলগা করে জামার কলারের বোতামটা খুলে দিলাম, একটু হাঁসফাঁশ-হাঁসফাঁশ লাগছিল, কেমন যেন ফাঁসীর দড়ির মত চেপে ধরেছিল এই টাইটা! শুধুই কি টাই, নাকি জীবনটাই? ড্রাইভারকে শুধু বলে দিলাম যে কোথায় যেতে হবে। গা-টা এলিয়ে দিয়ে শুধু এটাই ভাবছিলাম যে ঐ অভিশপ্ত প্লেন তিনটির একটায় আমি থাকলে সেটা কি আমার জন্যও অভিশাপ হতো, নাকি আশীর্বাদ? একবার মনে হল যে থাকলে ভালোই হত, ল্যাঠা চুকে যেত। লাইফ-ইন্সুরেন্স তো করাই আছে, ঘটনাচক্রে সেই ইন্সুরেন্স কোম্পানির নামও আবার ‘নিউ-ইয়র্ক লাইফ’! তার থেকে ও মিলিওন-ডলার পেয়ে যেত। সেটাই তো চায় ও আমার কাছ থেকে, ডলার - আরো ডলার। ঠিক সেটাই হত, আর আমাকে নিত্য ডলার-মেসিনের মত ‘ইউস’ করাটা ওর জন্মের মত ঘুচে যেত। একটা মিলিওন ডলারের ‘পে-চেকে’ই সেটা চিরতরে থেমে যেত। আর আমার কোন পরিচয় আছে এখন? আমি মানুষটা খারাপ না ভালো, আমার কি ইচ্ছা-অনিচ্ছা তাতে কি আর ওর যায়-আসে কিছু? আমার দাম তো শুধুই আমার ঐ ‘বাই-উইক্লি’ প্র-চেকটার ওপর যে ‘অ্যামান্ডেন্ট’টা লেখা থাকে, ঠিক তার সমান। প্রকারান্তরে ঠিক সেটাই হত - আমি হয়ে যেতাম ‘মিলিওন-ডলার-ম্যান’! নিউ-ইয়র্ক সিটির ঐ যে জায়গাটাকে এখন বলা হচ্ছে ‘গ্রাউণ্ড-জিরো’, সেখানেই শুয়ে আমি হয়ে যেতাম ‘হিরো’! নিউ-ইয়র্ক সিটির ‘গ্রাউণ্ড-জিরো’য়, ‘নিউ-ইয়র্ক লাইফ’র ইন্সুরেন্স-চেকটার সৌজন্যে মিলিওন-ডলার-‘হিরো’ হয়ে শুয়ে, এই বক্রিশেষই মোক্ষ লাভ করেছি আমি, কোনরকম সাধনা বা সন্ন্যাস ছাড়াই, সব অশান্তির শেষে চির-শান্তিতে ঘুমিয়ে আছি আমি; ভেবে বেশ ভালোই লাগল। পরক্ষণেই সামলে নিলাম নিজে, এইসব কি ভাবছি আমি? গ্রেস, মায়া আর কেইটি তো আমাকে ছাড়া শুতেই যেতে পারে না! সকালেই বা ওদের ঘুম থেকে তুলবে কে? আর তুললেও, তারা কি আর ওদের ঘুমন্ত-মুখের অঙ্গভঙ্গির ছবি তুলে রাখবে? সেসব ছবি তুলে না রাখলে চলবে কি করে? হেল্প না করলে মায়াটাতে টুথ-ব্রাশটাই ঠিকঠাক ধরতে শিখল না এখনও, তা ‘সেই হেল্প’-টা করবে কে? গ্রেসও তো জুতোর ফিতেটাই বাঁধতে শিখল না আজ পর্যন্ত; জুতোটা কোনরকমে পায়ে গলিয়ে দিয়েই পা-টা বাড়িয়ে দেয় আমার দিকে, ফিতে বেঁধে দেবার জন্য - তা ‘সেই ফিতে’টা বাঁধবে কে? কোথাও যাবার জো আছে আমার? মোক্ষ আর শান্তি কি অতই সস্তা? সুসানার কাছে আজ সকালে বাচ্চাদের পাচার করার সময় দেখে এসেছিলাম যে কেইটি মহা আনন্দে ওর ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা চিবুচ্ছিল, পারে তো ওর পুরো মুষ্টিটাকেই মুখের ভেতর ঢুকিয়ে দেয় আর কি! ওর বোধহয় মাড়ি শুলায় আজকাল, খুব শিগগিরিই হয়ত ওর দাঁত ওঠা দেখতে পাব।

মাঝ দুপুরেই বাড়ি ফেরত এলাম। ‘উইকডে’র ভরদুপুরে বাড়ির পরিবেশটা কেমন যেন অচেনা লাগল, কেমন যেন একটু থমথমে। লিভা নেই, বাচ্চারা নেই; ফিস-ট্যাক্সের মাছগুলোর ক্লাস্তিহীন সাঁতার ছাড়া শুনশান বাড়ির চেহারাটা কেমন যেন প্রাণহীন, শুধু বড় আর ছোট লিভিং-রুমের দেওয়াল-খড়ি দুটো অবিরাম কথা বলে চলেছে নিজেদের মধ্যে - টিক-টক, টিক-টক। আওয়াজটা যে এত জোরে শোনা যায় সেটা আগে কখনো খেয়াল করিনি তো! কিছু ফোন-কল করার ছিল, সেগুলোই সরে নিলাম। প্রথমে রচেস্টারে ‘কোডাকে’, তারপর আমার কাজে ইউনিভার্সিটিতে। কোডাকের ইন্টারভিউটা দু-সপ্তাহ বাদে রি-স্কেজুল করা হোল। প্লেনের টিকিট ওরাই কেটেছিল, ওরাই সেটা রি-বুক করে আমাকে তার ই-মেইল কনফার্মেসান পাঠিয়ে দেবে তা জানিয়ে দিল। এদিকে আমার কাজ থেকে মঙ্গল-বুধ ছুটি নিয়েছিলাম; মঙ্গলে তো আর কিছুই হল না, মাঝখান থেকে ছুটিটাই শুধুশুধু জলাঞ্জলি গেল। সেক্রেটারি ‘মারিয়া’কে বলে দিলাম আমার বুধবারের ‘ছুটি’ ‘ক্যান্সেল’ করে দিতে, আর ‘ডক্টর স্টিফেন্স’কে জানিয়ে দিতে যে আগামিকাল ওনাকে আর আমার হয়ে ‘সাব’ করতে হবে না। মারিয়া শুনে খুব খুশি হল যে আমি এখনও

এখানে, এই ক্যালিফোর্নিয়াতেই - ‘সেফ’। পরে দু-একজন ‘কলিগ’ আর স্টুডেন্টসদেরও ফোন-কল পেলাম, তারাও সবাই জানাল যে আমি ‘সেফ’ জেনে তারা আশ্বস্ত।

বাচ্চাদের কিচরিমিচির ছাড়া এই শুনশান বাড়িটাকে কেমন যেন শূন্যশূন্যের মত লাগছিল। তাই তড়িঘড়ি ডে-কেয়ারে গেলাম ওদের তুলতে - ওদের সাথে আজ বেশ খেলা করা যাবে এখন! ‘সুসানা’ও আমাকে দেখে খুব খুশি হল, ওর ভাঙা-ইংরেজি, আর স্প্যানিশ মিশিয়ে আমাকে বোঝাল যে কি আশ্চর্য - ও তো আজ সকালে এত করে আমাকে এটাই বলতে চেয়েছিল যে আজ আর আমার নিউ-ইয়র্ক গিয়ে কাজ নেই! গ্রেস আর মায়া আমাকে দেখে আনন্দে হাত তালি দিয়ে আর ওদের চুলের ঝুঁটি দুলিয়ে বারকয়েক লাফাল, আর সুইঙে দোল খাওয়া কেইটি ওর প্রায় ‘ন্যারা-মুণ্ডি’ মাথাটা একদিকে হেলিয়ে, মুখ থেকে দুধ উগলে, জিভ বার করে ফোকলা মুখে এমন ফিক করে হাসল যে ও যেন আগে থেকেই জানত যে আজ ওকে আমিই বাড়ি নিয়ে যেতে আসব। যা ভেবেছিল ঠিক তাই হওয়াতেই এই নির্মল হাসি-উপহার! এমনিতে তো ওদের মা-ই আসে ওদেরকে বাড়ি নিয়ে যেতে।

বাড়ি ফিরে লিভাকেও ফোন করে কথাটা জানিয়ে দিলাম, যে মেয়েদের ডে-কেয়ার থেকে তুলে নিয়েছি। ও বলল যে ও-ও আজ তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরছে, ওর অফিস আজ একটু আগে-আগেই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, জঙ্গি-নাশকতার ভয়ে। এদিকে নাকি আমাদের এই এত সাধের ‘গোল্ডেন-গেট’ ব্রিজটাকেও জঙ্গি-নাশকরা ‘টাগেট’ করে থাকতে পারে। তাই রাস্তা-ঘাট সব বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই ও বাড়ি ফিরে এল। আমরা সবাই মিলে দিনের বাকী সময়টা আমাদের বড় লিভিং-রুমের বড় টিভিটার স্ক্রিনে চোখ স্টেটে বসে থাকলাম।

টিভিতে আজ শুধুই জঙ্গিদের নাশকতার খবর। কান্নাকাটির খবর। বেশীরভাগ ‘ভিকটিম’কেই এখন ‘নিখোঁজ’ বলে চালানো হচ্ছে, অথচ তাঁরা যে মৃত সেটা অবশ্যস্বীকারী। যেন ‘অনেক কিছু আশা’ করার পরেও আবার ‘আরও বেশ কিছু আশা’ করা! ‘এই’ আশা করাটার যেন আর কোন শেষ নেই! এই ‘নিখোঁজ’-‘মৃত’দের পরিবারের লোকজন আকুলি-বিকুলি করে কেঁদে-কেটে টিভিতে এমন করে সব ইন্টারভিউ দিচ্ছে যে দেখে কেমন যেন মনে হল। আচ্ছা, এখানে যা দেখাচ্ছে - এইসব কান্নাকাটির পুরোটাই কি সত্যি, সৎ? এই কান্নাকাটির পুরোটাই কি মানুষগুলোর জন্য, নাকি ‘ডলার-মেসিন’? এই মৃতদের মধ্যে এমন কেউই কি নেই, যাঁদের নিজেদেরই ‘সেই আশা’টার হয়ত আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না, যাঁদের জীবনগুলোই হয়ত হয়ে উঠেছিল প্রহসন আর ফাঁকি; যারা প্লেন তিনটেতে ওঠার আগেই জীবনের চাহিদা মেটাতে মেটাতে ফুরিয়ে গিয়ে হয়ে গিয়েছিল জীবনমৃত? যাঁরা হয়ত মরেই বেঁচে গেল?

সন্ধ্যাবেলা কোলকাতা থেকে দাদার ফোন এল। ও বলল “কিরে ‘মানু’, তোদের ওখানে নাকি কাল কি সব হয়েছে? তোরা সবাই ঠিক আছিস তো?” ওকে বোঝালাম যে আমার এখানে ‘কাল’ নয়, ‘আজ’, আজকেই সাত-সকালে; নিউইয়র্কে সকাল নটা নাগাদ, আর আমার এখানে ক্যালিফোর্নিয়ায় ভোরে। ‘এখানে’ ক্যালিফোর্নিয়াতে কিছুই হয়নি, যা হয়েছে তা নিউ-ইয়র্কে। আমাদের মাঝে দূরত্ব হিন্দুস্থান-পাকিস্তানের তিন গুন, চার-চারটে ‘টাইম-জোন’ পেরিয়ে! ভাবলাম একবার বলি যে আমার এখানে যা ঘটেছে বা ঘটছে তা ‘আজ’কের নয়, তা অনেকদিনের; তা কোন স্কাই-স্ক্র্যাপারে বা টাওয়ারে নয়, তা আমাদের এই একতলা বাড়িটার ভেতরেই! তা আমাদের বেড-রুমে, তা আমাদের লিভিং-রুমে, তা আমাদের ‘ফ্রন্ট-ইয়ার্ডে’, তা আমাদের ‘ব্যাক-ইয়ার্ডে’; তা আমাদের মনে। আমাদের এই বাড়িটায় কোন প্লেন আছড়ে পরেনি, আছড়ে পড়েছে আমাদের জীবন। তারপর ভাবলাম যে না থাক, কি হবে বলে? ও কি আর বুঝবে? আমি নিজেই কি ছাই ঠিকঠাক বুঝি, যে ওকে বোঝাব? এইসব কি আর বলে বোঝানো যায়? শুধু জানালাম যে অনেক রাত হল; মেয়ে-তিনটির চোখগুলো ঘুমে ঢুলু ঢুলু, আমি সাথে না শুলে ওরা শুতে চায় না, তাই এবার শুতে যাই। ফোনটা হ্যাং-আপ করে ভাবলাম ঠিকই তো, সময়মত শুতে না গেলে চলবে কি করে? কাল ভোরেইতো আবার সেই কয়েকটা গুঁতো খেয়ে উঠতে হবে, দরজায় খিল দিতে হবে না?

পুনশ্চ: এরপর আর বছরখানেকের মধ্যেই গৌতম-লিভার আলাদা জীবন শুরু হয়, তিন মেয়েকে প্রতি এক সপ্তাহ অন্তর ভাগাভাগি করে। ■

# ভাষার বিড়ম্বনায় ক্ষুদ্দা

## - অনুপম গুপ্ত

এই সৌর জগতে পৃথিবী নামক গ্রহের মানুষ নানা ভাষায় কথা বলে, মনের ভাব প্রকাশ করে।

দেশভেদে কত ভাষা, অসংখ্য। তারা পূজো করে, ঠাকুরের কাছে অনেকে প্রার্থনাও করে। সবগুলো এ্যাকসেস্টেড না হলেও, কিছু কিছু তো হয়ই। এতগুলো ভাষার ট্র্যাক রাখার দায়িত্ব একমাত্র দেবী সরস্বতীর। ডিভিশন অফ লেবার মা দুর্গা তো ক'রেই দিয়েছেন, অর্থাৎ হোম ডিপার্টমেন্ট সামলানো ছাড়া তাঁর আর বিশেষ কোনও কাজ নেই।

সে যাক, দেবতাদের ব্যাপার দেবতারাই সামলাবেন, আমাদের সমস্যা ক্ষুদ্দা মানে ক্ষুদিরাম চাকলাদার এবং তার স্ত্রী রমলা বৌদিকে নিয়ে। যদিও রমলা বৌদির সমস্যাই বেশি। সরস্বতী পূজোর প্রধান মন্ত্র “বিদ্যা স্থানেভ্য এবচ”-র বদলে বৌদির মন্ত্র “বিদ্যা স্থানে ভয়ে ব চ”। তাই ভয় হয়তো এ জীবনের মতো থেকেই গেল।

প্রয়োজনে বা অপ্রয়োজনে ক্ষুদ্দাদের অনেকবার জাপানে যেতে হয়েছে। শুধুমাত্র ভাষার সমস্যায় তাদের আনন্দধারা মাঝে মাঝে বিঘ্নিত হত। বছবার হেঁচটও খেতে হয়েছে। জাপানি কনভারসেশনে হেঁচট খাওয়ার প্রতিযোগিতায় ভিকটরি স্ট্যান্ডে ওঠার সম্ভাব্য প্রতিযোগী শ্রীমতী রমলা চাকলাদার। নিজের মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোনও ভাষার সঙ্গে তিনি ভাব জমাতে পারেন নি।

একদিন বৌদির পুত্রবধূ বাড়ীতে ছিল না। বৌদির হঠাৎ সখ হোল বৌমার হাই হিল জুতো পরে একটু বেরোবেন। বৌমা বুঝতেও পারবে না। ক্ষুদ্দার সতর্কীকরণ উপেক্ষা ক'রে বৌদি শপিং মল লাযোনা-তে গেলেন। দাদার কাছ থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে এমন ভাবে হাঁটতে লাগলেন যেন বিউটি কনটেস্টে ramp এ হাঁটছেন। কিছুক্ষণের মধ্যে পা মুচকে পপাত ধরনী তলে। উপস্থিত জাপানি মহিলারা বৌদিকে সাহায্য করতে ছুটে এলো। ততক্ষণে হাই হিলের সাথে আঁচলের জড়ির জড়া জড়ি এবং তাদের সাময়িক শান্তিপূর্ণ অবস্থান। সাহায্যের জন্য ব্যাকুল আর্জি। কিন্তু জাপানি শব্দের সীমিত ভাণ্ডার থেকে তিনটি শব্দের প্রয়োগে সাহায্যে ইচ্ছুক মহিলারা হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো এবং বিশ্বয়ের শেষ সীমায় পৌঁছে, সেই জায়গা ত্যাগ করলো। বৌদি বলেছিলেন, “সুমি মাসেন, গোমেন-নাসাই এবং দামে”। তার মানে দাঁড়ালো মাফ করবেন, দুঃখিত, সাহায্য করবেন না”।

একবার এক জায়গায় তিন চারদিন ব্যাপী এক বিশাল মেলা হয়েছিল। বৌদি তার ফুটফুটে সুন্দর নাতনিকে নিয়ে ওই মেলায় গেলেন। মেলায় যাওয়ার মূখ্য উদ্দেশ্য নাতনিকে দেখানো। সব পিতামহী বা মাতামহীদের হয়তো একইরকম ইচ্ছা থাকে। তবে বৌদির আদিখ্যেতা একটু বেশি, তা নিয়ে তর্ক চালানো যেতে পারে। কিন্তু বৌদি প্রচণ্ড রেগে গিয়ে ক্ষুদ্দাকে বললেন যে তিনি

বাড়ী ফিরতে চান। ওই বাচ্চার মধ্যে কান্না ছাড়া আর কি কিছুই নেই? আসলে মেলার সব দর্শকই বলছেন “কাওয়াই নে” (কি সুন্দর!) আর বৌদি মনে করছেন ওরা বলছে “কাঁদুনে”। ভাষার সমস্যা --- মা সরস্বতীর একটু হেল্প করা উচিত ছিল।

ক্ষুদ্দা বৌদিকে অনেকবার বলেছেন যে, জাপানে যখন প্রায়ই আসতে হয় তখন একটু জাপানি ভাষা শিখে নেওয়া উচিত। যেমন এক, দুই, তিন --- এগুলোকে জাপানি ভাষায় কি বলে অবশ্যই শিখে নেওয়া উচিত। অনেক কষ্ট ক'রে বৌদি বলতে পারেন ইচি, নি, সান। একশো ইয়েনকে জাপানিতে বলে হিয়াকু ইয়েন। পাঁচটা হিয়াকু ইয়েনের জিনিস কিনে দুটো ফেরত দিলে কত হিয়াকু ইয়েন দিতে হবে সেটা বৌদির মাথায় একদম যেটে যায়। সেই সমস্যা অবশ্য কলকাতাতেও হয়। দাদা কতদিন রাগ করেছেন। বৌদি নাকি একবার স্কুলে কোনও এক পরীক্ষাতে ইংরেজিতে দশ আর অঙ্কে শূন্য পেয়েছিলেন। বৌদির বাবা বলেছিলেন, “ইংরেজিতে তবু যা হোক দশ পেয়েছো, কিন্তু অঙ্কে কি ক'রে শূন্য পেলে”? বৌদির তাৎক্ষণিক জবাব, “যারা সাহিত্যে একটু ভাল হয়, তারা অঙ্কে একটু কাঁচাই থাকে”। সে যাইহোক, বৌদির অঙ্কের মাথা দেখে ক্ষুদ্দা বৌদিকে বলেছিলেন, “হয়তো কখনও অঙ্ক বিশারদ আর্থাভট্টের ছাত্রী ছিলে তুমি”।

বৌদি --- ‘হ্যাঁ, তাতে কি হোল’?

ক্ষুদ্দা --- “তিনি তো তোমার অঙ্ক পরীক্ষা নিতেন”।

বৌদি --- “হ্যাঁ, তাতেই বা কি হোল”?

ক্ষুদ্দা --- “তোমার অঙ্ক পরীক্ষার খাতা দেখতে দেখতেই তো তিনি শূন্য আবিষ্কার করলেন”।

ক্ষুদ্দার এক মাসতুতো ভাই দীর্ঘদিন জাপানে আছেন। লোকে বলে অনেক দিন জাপানে থাকতে থাকতে তিনি নাকি একদম জাপানিদের মত দেখতে হয়ে গেছেন। জাপানিদের মত কথাও বলতে পারেন। একবার ক্ষুদ্দাকে নিয়ে ট্যাক্সি ক'রে কোথাও যাচ্ছিলেন। ট্যাক্সি ড্রাইভারের সাথে তার জাপানি ভাষায় কনভারসেশনের বাংলা তর্জমা ক'রে দেওয়া হোল ---

ড্রাইভার --- “স্যার, একটা কথা বলবেন”?

ক্ষুদ্দার ভাই --- “হ্যাঁ, বলুন”।

ড্রাইভার --- “আপনি এই ভদ্রলোকের সাথে কথা বলছেন, সেটা কোন দেশের ভাষা”?

ক্ষুদ্দার ভাই --- “ইন্ডিয়ান নাম শুনেছেন? সেই দেশের একটি রাজ্যের ভাষা এটা”।

ড্রাইভার --- “তা আপনি এই ভাষা জানলেন কেমন ক'রে? কোথায় শিখেছেন”?

মন্তব্য নিশ্চয়োজন!

ক্ষুদ্দার ছেলে জাপানের একটা ইন্টারন্যাশনাল ম্যানেজমেন্ট কলেজের ছাত্র ছিল। ওর এক রাশিয়ান বন্ধু ওকে জিজ্ঞেস করেছিল, ও কি ক'রে এতগুলো দেশের ভাষা জানলো? ইন্টারন্যাশনাল কলেজের ছাত্র, তাই ইংরেজি জানবে বলাইবাহুল্য। অনেক দিন জাপানে আছে, তাই জাপানি ভাষা জানারই কথা। এছাড়া আরেক বন্ধুর সাথে আরেকটি ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারে। আসলে সেই বন্ধুর নাম সোহেল, বাংলাদেশ থেকে এসেছে। দেশ আলাদা হলেও দুজনের মাতৃভাষা এক!

একবার লাঘোনা শপিং সেন্টারে ক্ষুদ্রদা আর বৌদি গেছেন বাজার করতে। আরও কিছু জিনিষের সাথে চিনিও কিনতে হবে। কিছুতেই ক্ষুদ্রদা স্টাফদের চিনি জিনিষটা বুঝিয়ে উঠতে পারেন না। চা পানের ব্যাপারটা তিনি বডি ল্যান্ডুয়েজ দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু কিছুতেই বোঝাতে পারছিলেন না যে তার চিনি চাই। বডি ল্যান্ডুয়েজ দেখে অনুমান ক'রে তারা কাপ প্লেট চামচ কফি সবই দেখালো, একমাত্র চিনি ছাড়া। হঠাৎ বৌদি রাগ ক'রে বলে উঠলেন, “আরে, এরা কি কোনদিন শুগারের নাম শোনেনি”? এক মহিলা কর্মী শুগার শব্দটা জানতেন। চিনিকে জাপানিতে বলে সাতো। মহিলা কর্মীটি তাদের সাতোর জায়গায় নিয়ে গেলেন। অনেক পরিশ্রমের পর চিনির স্বাদ আরও মিষ্টি মনে হোল। দাদা গাইলেন,

“আমি চিনি গো চিনি তোমারে  
ওগো বিদেশিনী”।

ক্ষুদ্রদার কি খেয়াল হোল একবার ছেলের সাহায্য ছাড়াই সেলুনে গেলেন। প্রথমেই দরজার কাছে রাখা একটি মেশিনে এক হাজার ইয়েনের নোট ঢোকাতে হয়। একটা রিসিট বেরিয়ে আসে। সেটা নিয়ে অপেক্ষা করতে হয়। কিছুক্ষণ পর ক্ষুদ্রদার ডাক আসলো, নির্দিষ্ট চেয়ারে বসলেনও। যে জাপানি ছেলেটা চুল কাটবে সে অত্যন্ত নম্রভাবে কিছু বলছে, কিন্তু দাদা এক বর্ণও বুঝতে পারছেন না। দাদার ঝুলিতে জাপানি ভাষার যা যা স্টক জমা ছিল সবই প্রয়োগ করলেন। ছেলেটি সবগুলোই বাতিল ক'রে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে কিছু বলেই যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত দরজার দিকে কিছু দেখালো। দাদার তখন খেয়াল হোল দরজার কাছে রাখা মেশিন থেকে এক হাজার ইয়েনের যে রিসিটটা বেরিয়েছে, সেটাই ছেলেটার চাই। বডি ল্যান্ডুয়েজে কত কাজই হয়!

জাপানে ট্যাক্সি ড্রাইভাররা সব সময় ওয়েল ড্রেসড, ক্লিন শেভড থাকে। স্বক্ৰমকে গাড়ীর ফটফটে ড্রাইভার! একেক সময় সুবেশা সুন্দরী মহিলা ট্যাক্সি ড্রাইভারও দেখা যায়। ক্ষুদ্রদা ভাগ্য গণনা করতে পারেন কি না জানিনা, কারণ বেশ কয়েকবারই সুন্দরী মহিলা ড্রাইভারের ট্যাক্সিতে তিনি উঠেছিলেন। অবশ্য যাত্রাপথ খুশীর মেজাজে প্রলম্বিত হয়েছিল কি না জানা নেই। একবার বাজার ক'রে বাড়ী ফিরবেন, ট্যাক্সি ডাকলেন। ট্যাক্সি ড্রাইভার এক সুন্দরী মহিলা। জিনিস রাখার জন্য দাদা তাকে ডিকি খুলতে অনুরোধ করলেন। মহিলা প্রচণ্ড হাসতে লাগলেন। দাদা তো অপ্রস্তুত। বলতে চাইলেন, “উশিরো ওনেগাইশিমােসু”, মানে পেছনের ডিকিটা একটু খুলে দেবেন? কিন্তু মারাত্মক ভুলবশতঃ উশিরোর বদলে তিনি বলে চলেছেন, “ওশিরি ওনেগাইশিমােসু” মানে পশ্চাৎদেশটা একটু খুলে দেবেন? নেহাৎ ভাগ্যের জোরে এর পরেও দাদার ভিসা ক্যানসেল ক'রে দেওয়া হয় নি, হতেই পারতো। দেশের খবরের কাগজে ছাপা হোত, “প্রৌঢ় বাঙালী কর্তৃক জাপানি মহিলার সম্মানহানি। জাপানি নারীর প্রতি অসম্মান প্রদর্শনে জাপানি সাহায্যে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প স্থগিত। আলোচনায় বিধানসভা উত্তাল”। এ সবই হতে পারতো, তবে হয় নি।

বৌদির প্রশ্ন, আচ্ছা যদি ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধ ইংরেজদের সাথে না হয়ে জাপানিদের সাথে হোত, তাহলে কি হোত? অন্তত নেসফিল্ড গ্রামারের হাত থেকে বাঁচা যেত। ক্ষুদ্রদার ব্যাখ্যা, “আরে বাবা ইংলিশ গ্রামারের বদলে জাপানিজ গ্রামার শিখতে হোত। ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পানির বদলে প্রাথমিকভাবে মিৎসুবিশি ইন্ডিয়া কম্পানি দেশ শাসন করতো। ইডেন গার্ডেনস স্টেডিয়ামের নাম হোত সুমো গার্ডেনস স্টেডিয়াম এবং ক্যাব বা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলের নাম হোত স্যাব বা সুমো অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল। ডালহৌসি স্কোয়ারের নাম হোত তোজো স্কোয়ার। বাই সাইকেল থিফ মুভি নিয়ে মাতামাতি না ক'রে সেভেন সামুরাই নিয়ে মাতামাতি করতো। ফিল্ম ডিরেক্টর কুরোসাওয়ার ছায়ায় হয়তো সত্যজিৎ রায়

হারিয়ে যেতেন। ডে অ্যান্ড নাইট লিমিটেড ওভরের ক্রিকেটের বদলে লিমিটেড সময়ের সুমো কম্পিটিশান হত। সচীন, সৌরভের জায়গায় মুশকো মুশকো চেহারার সুমো কুস্তিগীরদের জন্ম হত। ধনি বা কোহলির নাম কেউ জানতো না। শেকসপিয়ারের মার্চেন্ট অফ ভেনিসের শাইলকের চরিত্র বিশ্লেষণ করার ঝামেলা থাকতো না। সপ্তপদী উপন্যাসে ওথেলো আর ডেসডিমনা চরিত্রের প্রয়োজন হত কি? উৎপল দত্তকে শুধু টিনের তলোয়ার নাটক নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হত। ওথেলোর সংলাপ “ইট ইজ দ্যা কজ, ইট ইজ দ্যা কজ” বলার জন্য কাউকে সাধাসাধি করতে হত না। লোকেরা সকাল সন্ধ্যা গুড মর্নিং গুড ইভিনিংয়ের বদলে ওহাইও গোয়াইমাস, কোমবানওয়া বলতো। বাঙালী মহিলাদের রক্ষন প্রণালীও পাল্টে যেত। চিৎড়ি মাছের মালাইকারি বা ইলিশ মাছের পাতুরি বদলে কাঁচা মাছ খাওয়ার প্রচলন হত। বৌদি অতি কষ্টে বমন করার ইচ্ছা সামলে বললেন, “না না বাবা, তার চেয়ে রেন অ্যান্ড মার্চিন মুখস্ত করা অনেক ভাল। সৌরভ গাঙ্গুলীর বদলে সুমো রেসলারের ছবি”! মাগোঃ! দাদা বললেন, “জাপানে ল্যান্ডুয়েজ প্রবলেম ছাড়া আর সবই তো খুব ভাল”।

শেক্সপিয়ারের একটা কবিতার কয়েকটা লাইন

“Come hither, come hither, come hither

Here shall he see

No enemy

But winter and rough weather”.

দাদা বললেন শেষের লাইনগুলো একটু পাল্টে দিলে কেমন হয়?

“Here shall he see

No enemy

But only language barrier”.

ভাষার বিড়ম্বনায় দাদা যতই বিরক্ত বিব্রত বিভ্রান্ত বিধ্বস্ত হন না কেন, জাপান আছে জাপানেই, পৃথিবীর সেরা দেশগুলোর অন্যতম। জাপানেও দাদা বৌদিকে যেতেই হবে। ■





অগাষ্ট মাস ২০১৫ সাল। আজ থেকে ৭০ বছর আগে এই অগাষ্ট মাসে হিরোশিমা আর নাগাসাকির উপর অভিশাপের মতন নেমে আসে আণবিক বোমা। সে যে কি ভয়াবহ, কি নৃশংস, তা শুধু ছবি দেখেও শিউরে উঠতে হয়। আসল সময়টা না জানি আরও কত বীভৎস ছিল। ৭০ বছর আগে যাঁরা আণবিক বোমার বীভৎসতা নিজের চোখে দেখেছেন, তাঁরা আজও তার জের নিঃশব্দে টেনে চলেছেন। অগাষ্ট মাস এলে তাঁদের মনে নিশ্চয়ই আরও বেশী করে জেগে ওঠে সেদিনের সেই ভয়াবহ স্মৃতি। কারণ এই সব নিষ্ঠুর অমানবিক ঘটনা মনে যে ক্ষত সৃষ্টি করে তা শত চেষ্টাতেও কোনদিন মুছে যায়না। আমি জানি কারণ আমিও যে ভুক্তভোগী। তাই ওঁদের মতনই অগাষ্ট মাসটা আমার কাছেও বড়ই যন্ত্রণাদায়ক। এই সময়টাতে ফিরে আসে সেই সব স্মৃতি যা মনের গহনে ঘুমিয়ে আছে। যাকে জাগতে দিতে চাইনা। ফিরে দেখতে ভয় পাই সেই সময়টাকে। কিন্তু যতই আপত্তি থাকুক সুযোগ পেলেই সেসব স্মৃতি ঘুম ভেঙ্গে ছুঁতে চাই। বিশেষ করে এই সময়টাতে টিভিতে প্রায় সপ্তাহ দুই ধরে চলে হিরোশিমা নাগাসাকি নিয়ে নানান আলোচনা, সঙ্গে ছবি। দেখতে বা শুনতে না চাইলেও তার ধাক্কাটা মনে লাগেই, আর তা মনে করিয়ে দেয় আরেক অগাষ্ট মাসকে, ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হবার সময়কে। তখন ছোট ছিলাম। ভাল করে সব কিছু বোঝার বয়স হয়নি। তবু যেসব দৃশ্য দেখেছি, তা মনের মধ্যে গেঁথে আছে। মনে পড়লে আজও ভয়ে শিউরে উঠি।

আমার বাবা কাজ করতেন রেল-এ। সেই কাজের দৌলতে ছোটবেলা থেকে নানা শহরে থাকা হয়েছে। সেই রেল কম্পানির নাম আজ আর মনে নেই। তবে তার যাতায়াতের পথ ছিল অবিভক্ত ভারতের পশ্চিম অঞ্চলে অর্থাৎ এখনকার পাকিস্তানে। অনেক শহর ঘোরা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সব শহরের নাম বা কথা মনে নেই। তবে দুটি শহরের কথা আজও ভুলতে পারিনি। সে দুটি শহর হোল করাচী আর সিন্ধ হায়দ্রাবাদ। করাচীতে যখন ছিলাম তখন একটু বড় হয়েছি। কিছু কিছু বুঝতেও শিখেছি। ওখানে দুটো জিনিষ মজার লেগেছিল বলে মনে আছে। একটা হোল উটে টানা গাড়ী। আর অন্যটা হোল বাড়ীর উপরের বারান্দা থেকে দড়ি বেঁধে ঝুড়ি নামিয়ে জিনিস কেনা আর তার দামটাও ঐ একই ভাবে পৌঁছে যেত বিক্রেতার কাছে। করাচীতে বোধহয় বছর তিনেক ছিলাম। এরপর আমরা আসি সিন্ধ হায়দ্রাবাদে (এখন পাকিস্তানে)। এখানে অবশ্য ছিলাম শহরে নয়, শহর থেকে বেশ কিছুটা দূরে বিরাট রেল কলোনীতে। এই কলোনী ছিল তিনটে ভাগে ভাগ করা। একটা অংশ জুড়ে ছিল অফিস ও সেই সংক্রান্ত কাজের জন্য একটা বড় দোতলা বাড়ী। সেই সঙ্গে ছিল নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের বড় দোকান আর তারই এক ধারে ছিল চা-কফি খাবার ব্যবস্থা। পুরো অংশটা ছিল সুন্দর বাগান দিয়ে ঘেরা। বাকী দুটো অংশে ছিল সকলের থাকার ব্যবস্থা। একটা ভাগে ছিল অফিসারদের জন্য সামনে বাগান আর পিছনে উঠান দেওয়া সার সার সুন্দর দোতলা বাড়ী। এই বাড়ীর সামনে একটা বড় মাঠ রেখে অন্য ভাগে অন্যান্য কর্মীদের কোয়ার্টার। বাড়ী ছোট কিন্তু সুন্দর। সেখানেও সামনে ছোট এক টুকরো বাগান। এখানে আমাদের মানে ছোটদের মধ্যে যারা একটু বড় ছিল তারা কলোনীর বাসে করে শহরের স্কুলে যেত। আর আমরা যারা আরও ছোট ছিলাম, তাদের দূরে শহরের স্কুলে পাঠাতে অভিভাবকদের আপত্তি ছিল। তাতে আমাদের পোয়াবারো! বাড়ীতে মা-র কাছে যতটুকু পড়াশুনা করার করে ফেললেই ছুটি আর ছুটি। কলোনীর বাইরে

যাবার উপায় ছিলনা। গেটে বন্দুক নিয়ে দারোয়ান। তবে সে দরকারও ছিল না। বড় আনন্দে কেটেছে দিনগুলো। কলোনীর একধারে ছিল রেল লাইন। আর তার ওপারে গ্রামে স্থানীয় লোকেরদের বসবাস। সপ্তাহে দু দিন বাজার বসতো। গ্রামের লোকেরা সেদিন ক্ষেতের তরিতরকারী, ফুল, ফল আনতো বিক্রি করার জন্য। এখানে অবশ্য আমরা পুরো সময়টা থাকতে পারিনি। বেশ কাটছিল, তারপর হঠাৎ একদিন শুনলাম দেশ স্বাধীন হয়েছে। সে খবরে বড়রা সকলে কোলাকুলি ক'রে আনন্দে নাচতে শুরু করলেন। আমরা ছোটরা কিছু না বুঝে ভ্যাচাকা খেয়ে বড়দের কাণ্ডকারখানা দেখতে লাগলাম। কিন্তু এই আনন্দের রূপ পরদিনই বদলে গেল। সারা কলোনী যেন মন্ত্রবলে ছবির মতন স্থির। বড়দের মুখে চিন্তার ছায়া। কিসের অপেক্ষায় যেন সকলে অস্থির ভাবে পায়চারি করছেন। শেষ পর্যন্ত বিকেলের দিকে এলো সেই দুঃসংবাদ --- সিন্ধ হায়দ্রাবাদ পড়েছে পাকিস্তানে। আর চারিদিকে রায়ট শুরু হয়েছে। সকলে মিলে ঠিক করলেন যে ক'রেই হোক রাতের মধ্যেই এ জায়গা ছাড়তে হবে। মায়েদের জানানো হোল অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিস ছাড়া কোনো কিছু না নিতে। কয়েকজন ট্রেনের ব্যবস্থা ক'রে এসে জানালেন রাত আড়াইটার সময় মাইলখানেক দূরে একটা ট্রেন অপেক্ষা করবে। আধ ঘন্টা পরে তা ছেড়ে দেবে। সময়ের মধ্যে না এলে ফেলে রেখে যেতে হবে। সেই সঙ্গে জানানো হোল কলোনীর বাইরের লোকেরা যেন কিছু টের না পায়। তাই সব যেন নিঃশব্দে হয়। এত সব কথা আমার পক্ষে মনে রাখা বা তার মানে বোঝার কথা নয়। পরে বড় হয়ে মায়েদের কাছে অনেক কিছুই জেনেছি। হয়তো গ্রামের বেশীর ভাগ মানুষই মুসলমান বলে হিন্দুরা নানারকম সাবধানতার প্রয়োজন অনুভব করেছিল। তবে এটা স্পষ্ট মনে আছে মাঝরাতে ঘুম থেকে আমাদের টেনে তুলে শুরু হোল ভারতের উদ্দেশ্যে প্রাণ হাতে ক'রে অনিশ্চিত যাত্রা। সকলে সময়ের আগেই যথাস্থানে পৌঁছে গেছে। মাত্র তিনটি বগির বেশী পাওয়া যায়নি। তারই মধ্যে সকলকে উঠতে হবে যেভাবেই হোক। অল্প জায়গায় গাঙ্গাগাদি ক'রে কোনরকমে বসা। দমবন্ধ অবস্থা প্রায়। কিন্তু ট্রেন চলতে শুরু করলে ঝাঁকুনিতে সব যেন খাপে খাপে বসে গেল। তাতে অবস্থাটা একটু ভদ্র হোল। রাতের অন্ধকারে ট্রেন ছুটে চললো। কিছু দূর গিয়ে আরও দুটো বগি জুড়লো ট্রেনের সঙ্গে। তাতে অন্যান্য জায়গার হিন্দুরা। এরপর ক'দিন নির্বিঘ্নে অবিশ্রাম ছোটর পরে আস্তে আস্তে স্বাভাবিক দৃশ্যের বদল শুরু হোল। দেখতে পেলাম গ্রামের পর গ্রাম জুলাছে। কোন মানুষ চোখে না পড়লেও কোথাও তখনও গাছে বাঁধা গরু ছাড়া পাওয়ার জন্য ছটফট করছে। কোথাও বা কুকুর বেড়াল দিশেহারা হয়ে ছুটোছুটি করছে। এক জায়গায় হঠাৎ ট্রেন থেমে গেল। রব উঠলো মুসলমানরা দল বেঁধে আসছে। বড়দের মুখ শুকনো, চোখে ভয়। আর আমরা ছোটরা কিছু না বুঝেই ভয়ে কাঁদতে শুরু করলাম। পরে জানা গেল হিন্দুদের দল বেরিয়েছে মুসলমানদের ওপর হামলা করতে। ধর্মান্ধতা মানুষকে হিংস্র পশুতে রূপান্তরিত করেছে যেন। এর আরও ক'দিন পরে ট্রেন পৌঁছল যোধপুরে। ভারতে পৌঁছে সকলেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। এখানে একদিন বিশ্রামের পরে আবার যাত্রা শুরু। এবার লক্ষ্য দিল্লি। দিল্লি বেশী দূরের পথ না হলেও দেশের যা অবস্থা তাতে আরও কতদিন লাগবে কেউ জানেনা। মাঝপথে জানা গেল দিল্লিতে রায়টের মোকাবিলা করতে সাত দিনের কার্ফু জারি হয়েছে। ট্রেন তখন রেওয়াদিতে। কি হবে ভেবে বড়দের যখন মাথায় হাত, তখন এগিয়ে এসেছিলেন ভারত সেবাস্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসীরা। সঙ্ঘের ছোট তিন তলা বাড়ীতে অত জন লোকের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। দিল্লির সেই সাত দিনের কার্ফু শেষ পর্যন্ত তিন সপ্তাহ বহাল ছিল। এর মধ্যে আরেক

সমস্যা দেখা দিল । এ পর্যন্ত দেখা ভয়ঙ্কর দৃশ্যের প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে আমাদের ছোটদের মধ্যে । ঘুমের মধ্যে চমকে চমকে জেগে ওঠা, ভয়ে কাণ্ডা জুড়ে দেওয়া । অভিভাবকরা নিরুপায় । কিছুই করার নেই । সেটা যে সবে শুরু, তা তখনও জানতাম না । আরও কত ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতা অপেক্ষা করছিল আমার জন্যে ।

যাইহোক, তিন সপ্তাহ পরে আবার দিল্লি যাত্রা । অনেক ঝামেলা, অনেক হয়রানির পর এক সময় দিল্লি পৌঁছালাম আমরা । কিন্তু সেখানেও শান্তি ছিলনা । থেকে থেকেই গুণ্ডগোল মাথা চাড়া দিয়ে উঠতো । আমরা ছিলাম আমার মেজ পিসিমার বাড়ীতে । সেখানেও একধারে রেল লাইন আর মাঝখানে অনেকটা খোলা জায়গা রেখে দু ধারে সার সার বাড়ী । তা দেখে ছেড়ে আসা কলোনীর জন্য মন কেমন করতো ।

এরই মধ্যে একদিন হঠাৎ সন্ধ্যাবেলায় পাড়ার মেয়েদের আর বাচ্চাদের পৌঁছে দেওয়া হোল বিরাট বড় বাগান আর ভারী লোহার গেট বসানো এক বাড়ীতে । সেখানে বন্দুক নিয়ে পাহারায় দুজন নেপালী দারোয়ান । ছেলেরা সব লাঠি হাতে বেরিয়ে গেলেন পাড়া রক্ষা করতে । সারা রাত মুসলিম যুবকদের নারকীয় উল্লাস শুনে ভয়ে সিঁটিয়ে রাত কাটলো । পুলিশের তৎপরতায় সেদিন কিছু হয়নি । পরদিন সকালে বাড়ী ফিরে এলাম । কিন্তু আসল তাণ্ডব শুরু হোল তার পরদিন থেকে । পাশের বাড়ীর

পরিবারটি ছিল মুসলমান । তারা অবশ্য আগেই নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গিয়েছিলেন । তবু লুঠ হোল তাদের বাড়ী । মানুষ তখন প্রতিহিংসায় উন্মত্ত । একদল লোক বাড়ীর পাশের রেল লাইনে ট্রেন থামিয়ে মুসলমানদের টেনে নামিয়ে কচুকাটা ক'রে রক্তমাখা তরোয়াল নিয়ে হাসতে হাসতে ঘরে ঘরে গিয়ে জল চাইছে রক্ত খোবার জন্যে । আমার সামনে এসে একজন ঐ রকম ভাবে জল চাইতেই আমি ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যাই । আমি নিতে পারিনি সে দৃশ্য আর লোকটার তখনকার পিশাচের মতন হাসি । তারপর থেকেই দুঃস্বপ্ন আরও বেশী ক'রে তাড়া করেছে । আর তা দেখে কখনও কেঁদেছি, কখনও অজ্ঞান হয়েছি । সামান্য শব্দে চমকে উঠেছি ।

এরপর আমরা কোলকাতায় চলে আসি ডাক্তারের পরামর্শে । কোলকাতাতে বাড়ীর সকলেই ছিলেন । অসুবিধা হয়নি কোনও । নতুন পরিবেশে আমিও অনেকটা শান্ত । তবু এই দুঃস্বপ্ন বহু বছর ধরে আমাকে নিয়মিত তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে । বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কোনও এক সময় তা ঘুমিয়ে পড়েছে মনের গোপন কোঠায়, কিন্তু মুছে যায়নি । যখনই টিভিতে নানারকম তাণ্ডব আর নৃশংস দৃশ্য দেখাতে শুরু করে তখনই সব মাথা চাড়া দিয়ে জেগে ওঠে । আবার শুরু হয় বিনিদ্র রজনীর পালা । এই ভাবে কিছুদিন চলার পর আবার তা ঘুমিয়ে পড়ে মনের অতলে যতদিন না আবার কোনও ঘটনা ঘটে । কিন্তু এই পৃথিবীতে শান্তি কোথায় ? তা কি কোনদিন আসবে মানুষের জীবনে ? ■

The problems we face today,  
violent conflicts, destruction  
of nature, poverty, hunger, and  
so on,  
are  
human created problems  
which can be resolved  
through human effort,  
understanding, and a  
development of a sense of  
brotherhood and sisterhood.  
We need to cultivate a  
universal responsibility  
for one another and  
the planet we share.

- Dalai Lama  
(Nobel Peace Prize Acceptance Speech)

Bengali Association of Tokyo Japan এর অঞ্জলি পত্রিকার শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মণ্ডলী, আজ নেটে খুটুর খাটুর করতে গিয়ে এক গুপ্তধনের অধিকারিনী হলাম। আমার এই গোপন সম্পত্তিটি হোল Bengali Association of Tokyo Japan এর অঞ্জলি পত্রিকা। দেখে আবেগে আনন্দে আমার কণ্ঠরোধ হয়ে আসে। দূরদ্বীপবাসিনী অঞ্জলি --ভিন্ দেশে মাতৃভাষা ও সংস্কৃতি চর্চার কি চমৎকার এক প্রয়াস এই পত্রিকা। দেখে আমি আশুত। সাত সমুদ্র তেরো নদীর এপারে বসে আজ আমি গর্ববোধ করছি বাঙ্গালী বলে।

আমি একজন গৃহবধু। পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার কল্যাণীতে আমার বাস। আমি রান্না করতে ভালবাসি। আমার শ্বাশুরী সবিতা রাণী চক্রবর্তীর কাছেই প্রথম রান্নার হাতেখড়ি। পাবনার মেয়ে ছিলেন তিনি, আর রাজশাহীর বধু। বাংলাদেশের প্রাণকেন্দ্র ঢাকাতে ছিল তাঁর সইয়ের ঘর। অনেক ছোটবেলা থেকেই রান্নাবান্নায় তিনি পারদর্শী ছিলেন। তাই আমার রন্ধনশিক্ষায় ছিল সোনার বাংলার বুকভরা ভালবাসা। খোড় বড়ি খারা আর খারা বড়ি খোড়, একঘেয়ে জীবনে রান্না যেখানে খুস্তির খটখটানি আর নিছক উদর পুতি ছাড়া আর কিছুই নয়, সেখানে রান্না আমার কাছে শিল্প, আমার সাধনা। একজন প্রকৃত গুরুর মতই শ্বাশুরী মা রান্নায় তালিম দিয়েছিলেন। শ্বাশুরী মায়ের শিক্ষাকে পাঠেয় করে গণমাধ্যমের বৃহৎ জগতে পা দিয়েছি আমার সাধনালব্ধ রন্ধনশিল্পকে সর্বসাধারণের কাছে পরিচয় করিয়ে দিতে। কলকাতার বিভিন্ন টেলিভিশন কেন্দ্রের অনুষ্ঠানে করেছি অংশগ্রহণ। ভারতের কয়েকটি পত্রপত্রিকায় রন্ধন প্রণালীর কলাম লিখি। লিখি বাংলাদেশের পত্রিকাতেও। আন্তর্জাতিক স্তরের পত্রিকা হ্যাংলায় “হেঁশেলের ভানুমতি” প্রতিযোগিতায় পেয়েছি রৌপ্য পদক। পেয়েছি ‘সেরা শেফের’ শিরোপা শেলী মশলার তরফ থেকে। এরকম আরও কিছু পুরস্কার লাভের সৌভাগ্য আমার হয়েছে। দুর্গাপূজা উপলক্ষে আজ আমি ‘অঞ্জলি’র পাঠক পাঠিকাদের জন্য আমার নিজস্ব রান্নার কয়েকটি রেসিপি উপহার পাঠাচ্ছি। রেঁধে দেখুন কেমন লাগে। ভাল লাগলে বুঝবো আমার প্রয়াস সার্থক।

### ফুল তাপসী

**উপকরণ-** ৬টি বড় মাপের তোপসে মাছ, পিঁয়াজ-২টি, কাঁচালঙ্কা-৫টি, কালো সরষে ৫০ গ্রাম, চালের গুঁড়ো-১/২কাপ, হলুদ-১চা চামচ, লঙ্কারগুঁড়ো-১/২ চা চামচ, লবণ-স্বাদমতন, সরষের তেল-ভাজার জন্য।

**প্রণালী-** তোপসে মাছ ধুয়ে জল ঝরিয়ে নিতে হবে। পিঁয়াজ, কাঁচালঙ্কা, গোটা কালোসরষে হলুদ লঙ্কা দিয়ে বেটে নিন। এবার বেটে নেওয়া মিশ্রণের মধ্যে চালেরগুঁড়ো দিয়ে ভালো করে ফেটিয়ে নিতে হবে। তারপর তোপসে মাছগুলিকে ওই মিশ্রণে ডুবিয়ে ডুবো তেলে ভাজুন। ফুল তাপসী তৈরি। কিছু কথা-পাবনা জেলার বিশেষ পদ। সাধারণত জমিদার বাড়ির কোন এলাহি ব্যাপার-স্যাপারে এই পদ একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে থাকত। তোপসে মাছ ভাজার এই বিশেষ পদকে আগেকার দিনে গিন্নিরা ফুল তাপসী বলত রসিকতা করে। ফুলের মত সরু চালের ভাত দিয়ে খেতে ভালো লাগে বলে ফুল কথার ব্যবহার। তপস্বিনীকে যেমন সাধনার বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে সিদ্ধ হতে হয় তেমন এই মাছও বিভিন্ন মশলার স্তর পেরিয়ে সমৃদ্ধ হয়ে খাদ্যরসনার তৃপ্তি ঘটায়।।



### বাহারি -তেলাপিয়া

**উপকরণ-** তেলাপিয়া মাছ-৪টুকরো, সরষের তেল-পরিমাণমাফিক, ঝিঁরি ঝিঁরি করে কাটা পিঁয়াজ ছোট -১টি, হলুদ-২চা চামচ, লঙ্কার গুঁড়ো-১চামচ, জিড়েগুঁড়ো-১ চা চামচ, ধনেপাতাবাটা-২ টেবিল চামচ, টকদই-২টেবিল চামচ, চেরা কাঁচালঙ্কা-৪টি, নুন-স্বাদমতন, কুচানো ধনেপাতা-সাজানোর জন্য।

**প্রণালী-** তেলাপিয়া মাছ পরিষ্কার করে ধুয়ে নুন হলুদ মাখিয়ে নিন। উনুনে কড়াই বসিয়ে তেল দিন। তেল গরম হলে মাছ লাল করে ভাজুন। এবার মাছ আলাদা পাত্রে তুলে রাখুন। তেলে পিঁয়াজ হাল্কা ভেজে হলুদ, লঙ্কার গুঁড়ো, জিড়েগুঁড়ো, ধনেপাতাবাটা, নুন দিয়ে ভালো করে কষে সামান্য জল দিন। জল শুকিয়ে এলে দই ফেটিয়ে তাতে দিন, কাঁচালঙ্কা দিন। ভাজা মাছ সাবধানে সাজিয়ে দিন। এপিঠ-ওপিঠ করে নিন একটু ফুটে উঠলে নামিয়ে নিন, কুচানো ধনেপাতা ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।।



## ন্যাসপাতির চাপড়ঘন্ট

**উপকরণ-** ন্যাসপাতি-৫০০গ্রাম, আলু-২৫০গ্রাম, সরষে - শুকনোলংকা-ফোড়ন, মটরডাল-১০০গ্রাম, আদা-৫০গ্রাম, চিনি-৪চা চামচ, নুন-স্বাদমতো, ঘি-১চা চামচ, সরষের তেল ।

**প্রণালী-** প্রথমে ডাল নুন দিয়ে ১ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে । ন্যাসপাতি ও আলু ঝিরঝিরি করে কেটে নিতে হবে । ১ঘন্টা পর ডাল বেটে নিতে হবে । আদাও বেটে নিতে হবে । এরপর প্যানে সামান্য তেল দিয়ে ডালের গোল চাপড় সাবধানে ভেজে পুথক পাত্রে তুলে রাখতে হবে । এবার কড়াইতে সরষের তেল দিতে হবে । তেল গরম হলে তাতে সরষে-শুকনোলংকা ফোড়ন দিয়ে তাতে ঝিরঝিরি করে কাটা ন্যাসপাতি ও আলু ভেজে নিতে হবে । বেশ একটু নেড়েচেড়ে নিয়ে নুন দিতে হবে এবং ঢাকা দিতে হবে । কিছুক্ষণ পর ঢাকা খুলে ডালের চাপড় ও চিনি দিতে হবে ও ভালো করে মিশিয়ে দিতে হবে । আদাবাটা দিতে হবে ভালো করে নেড়েচেড়ে ঘি ছড়িয়ে নামাতে হবে । গরম গোবিন্দভোগ চালের ভাতের সাথে খেতে উপাদেয় ।।



## ইলিশ-ঐশ্বর্য

**উপকরণ-** ইলিশমাছ, পেটি-গাদা সহ-৪ পিস, কালো সরষে-২৫ গ্রাম, সাদা সরষে-২৫ গ্রাম, পোস্ত-১০গ্রাম, ফ্রেশ সিঙ্গল ক্রিম-২টেবিল চামচ, পিঁয়াজ-২টি, কাঁচালঙ্কা-৪টি, হলুদ-৩চা চামচ, নুন-স্বাদমতো, পাতিলেবু-১টি মাঝারি মাপের, সরষের তেল

**প্রণালী-** ইলিশমাছ প্রথমে ধুয়ে লেবুর রস দিয়ে ম্যারিনেট করে নিতে হবে । সরষে(সাদা-কালো), পোস্ত বেটে নিতে হবে । পিঁয়াজ বেটে নিতে হবে । এবার কড়াইতে সামান্য তেল দিয়ে সরষে-পোস্তবাটা, পিঁয়াজবাটা তাতে দিয়ে অল্প আঁচে নুন দিয়ে কষতে থাকতে হবে ও ফ্রেশ ক্রিম দিতে হবে । সামান্য জল দিয়ে ভালো করে নেড়েচেড়ে একটি মিশ্রণ প্রস্তুত করতে হবে । ওই মিশ্রণ ইলিশমাছে মাখিয়ে আধঘন্টা রেখে দিতে হবে । একটি প্যানে সরষের তেল দিয়ে গরম করে নিতে হবে । তেল গরম হলে ইলিশমাছ মিশ্রণ সহ তাতে ঢেলে দিতে হবে । অল্প আঁচে এপিঠ ওপিঠ করে ধীরে ধীরে রান্না করতে হবে । কিছুক্ষণ পর সামান্য জল দিয়ে কাঁচালঙ্কা গুলি ছেড়ে দিতে হবে । ঢাকা দিতে হবে । ফুটে উঠলে ভালো করে নেড়ে নিয়ে বেশ ঘন ঘন করে নামাতে হবে । নামানোর আগে কাঁচা সরষের তেল ছড়িয়ে নামাতে হবে ।।



## কাতলার তেলঝোল

**উপকরণ-** কাতলা মাছ-৫পিস, ঝিরি করে কাটা পিঁয়াজ-বড় ১টি, কাঁচালঙ্কা -৫টি, পরিমাণমাফিক সরষের তেল, হলুদ গুঁড়ো-২চা চামচ, লঙ্কাগুঁড়ো-১চা চামচ ।

**প্রণালী-** প্রথমে মাছের পিসগুলো ভালো করে ধুয়ে নুন ও হলুদগুঁড়ো দিয়ে মাখিয়ে রাখতে হবে । এবার কড়াইতে তেল দিয়ে মাছের পিসগুলো অল্প একটু ভেজে তুলে রাখতে হবে । ওই তেলেই পিঁয়াজ দিয়ে ভেজে নিতে হবে । হাল্কা বাদামি রঙ এলে মাছের পিসগুলো কড়াইতে সাজিয়ে দিতে হবে, সামান্য জল দিতে হবে । নুন হলুদ, লঙ্কাগুঁড়ো দিতে হবে । কাঁচালঙ্কাগুলি ছেড়ে দিতে হবে । অল্প একটু ফুটে উঠলে মাখো মাখো করে নামিয়ে গরম গোবিন্দভোগ চালের ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন ।।



## - দুহিতা সেনগুপ্ত

চার পা, দুটো হাত, আর পিছনে ... বেশ, শিরদাঁড়াই ধরে নিলাম।  
খয়েরির ওপর খয়েরি রঙ চড়িয়ে বয়স ঢেকেছিলে। বুঝতে দাওনি  
ভেতরে ভেতরে সেগুন কাঠেও ঘুন ধরে। শুধু চলেছিলে, হাঁটনি  
কোনোদিন। সাড়া দিয়েছিলে, সাড়া ফেলনি কোনোদিন। ধরে  
রেখেছিলে, ধরা দাওনি কোনোদিন। শুনে গিয়েছিলে, শোনাওনি কোনোদিন।  
জাগিয়ে রেখেছিলে, জাগোনি কোনোদিন। তোমার ওপর শুধু ক্রিয়া ছিল,  
প্রতিক্রিয়ায় জবাব মেলেনি, তবু কখনো কোনো টালমাটাল এর আভাস ছিল  
কি? মুহূর্তের জন্যেও?

হ্যাঁ, এক chair-এরি গল্প বলতে বসা। যার আকাশ ছিলোনা, বাসা  
ছিলো। যার নাম ছিলোনা, পরিচয় ছিল। ঠিকানা ছিলনা, অস্তিত্ব ছিল। যাতে  
আরাম ছিলনা, শুধু আশ্রয় ছিল।

হ্যাঁ, নিতান্ত এক chair, এরি পাঁচালি আওড়াতে বসা। চার হোক বা  
দুই, পা এরা নিজের ইচ্ছায় চলতে পারেনি। হাতল হোক বা হাত, ধরলে  
দুটোই ভরসা জোগায়। কাঠই হোক বা DNA, পুড়লে দুটোই Carbon।

Chair- ই হোক বা ঠাম্মা, চোখ যে আলাদা করতে পারেনি, পারেনা,  
পারবেনা কোনোদিন।

গন্ধটা নয় ভাসতে জানে।

ভুলতে জানে মন।

সময়, গর্ত ভরতে জানে,

একে অন্যজন।

ছোঁয়ায় ছোঁয়ার ওজন কমে,

সময় এর ওপর সময় জমে।

স্মৃতি মোছার পরিশ্রমে,

গন্ধমাদন।।

# আনন্দগান গা রে হৃদয়

- ভাস্বতী ঘোষ সেনগুপ্ত

মাইকেল মধুসূদনের 'হে বঙ্গ ভাঙারে তব'  
অতুলপ্রসাদের 'মোদের গরব মোদের আশা'  
রবিঠাকুরের 'বাংলার মাটি, বাংলার জল'  
শামসুর রাহমানের 'বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে'  
আর আমি লিখি বাংলা ভাষায় স্বপ্ন দেখি বলে।  
যে ভাষা আমার চেতনায়, জাগরণে  
চিনিয়েছে যোগীন্দ্রনাথ সরকার, বিদ্যাসাগর  
সুকুমার রায়, সুনির্মল বসু, বনফুল  
মাইকেল, শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল  
সুকান্ত, মুজতবা আলী -এই অসংখ্য বিদ্বানে।  
রবীন্দ্রনাথের 'শিশু' থেকে শুরু করে ব্রহ্ম উপাসনায়  
মাইকেল ভিন্ন আঙ্গিক আনেন মহাকাব্যের আঙ্গিনায়  
শরৎচন্দ্রের সহজ সরল পল্লী সমাজের ছবি  
আবার নজরুলের রচনায় জাতিধর্মের উর্ধে আবেগপ্রবণ কবি  
সুকুমার রায়ের আবোলতাবোলের মাঝে বিজ্ঞান  
অথবা বাউল গানে মানুষের মাঝে ধরা দেন ভগবান।

অন্যদিকে খবরের কাগজ, পঞ্জিকা অথবা ব্রতকথা  
লক্ষ্মীর পাঁচালী, দেবসাহিত্য কুটির কিম্বা রবিবাসরীয়া পাতা  
এই সবেই স্বাদ পেয়েছি মাতৃভাষার অবদানে  
নতুন নতুন প্রেরণা আনে আজও নানাভাবে নানাক্ষেপে।  
হঠাৎ কখন অজান্তেই ডুবে গেছি ছোটগল্প, উপন্যাসের গভীরে  
বিশাল খনির সন্ধান পেয়েছি, রস পেয়েছি অচিরেই  
যা বার বার পড়া যায়, তাই লাগবে বেশ কয়েকটা জীবন  
অমূল্য ভাঙার, অপূর্ব লেখনী আর অদম্য তার আকর্ষণ।  
ধন্য আমি যে জন্মসূত্রে বাঙালী  
সংস্কৃতি, উৎসব, সাহিত্য মিলিয়ে ভরে থাকে দিনগুলি  
প্রকৃতিও মানুষকে বাঁধেন সেই আত্মিক টানে  
যখন পৃথিবীর সকল বাঙালী একাত্ম হয় মায়ের আশ্রানে।  
শরত তাই নিয়ে আসে নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা  
চারিদিকে শিউলি, স্থলপদ্ম ও কাশফুলের মেলা  
বলা হয় বাঙালীর বারো মাসে তেরো পার্বণ  
কিন্তু দুর্গাপূজা আসলে মিলনের উৎসব, উৎসবে মিলন।।



# ভালবাসা

- নমিতা চন্দ

কোকিল গাহিছে গান আপনার সুরে  
নিত্যনতুন যুদ্ধ হয় দেবতা আর অসুরে।  
সূর্য ওঠে, বায়ু বয়  
ভূমিকম্প শান্ত হয়  
তবু কেন বাধা ?  
কৃষ্ণ সাথে মিলিবারে এসেছেন রাধা।  
পূর্ণ হোক সব আশা  
চিরস্থায়ী ভালবাসা  
বন্ধ কর কাম্মার রোল।  
হোক শুধু আনন্দের হিল্লোল,  
পূর্ণ করে সবাকার মন  
খুঁজে পায় কনক রতন।।



## স্বপ্ন নগরী

- বিশ্বনাথ পাল

ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ এখানে নেই  
নেই কোনো শিশির ভেজা সকাল,  
কংক্রিট আর অ্যাসফাল্টেতে মোড়া  
আমার শহর ব্যস্ত চিরটা কাল।  
পাখির ডাক এখানে শোনা যায়  
তবে সেটা বাজে অ্যালার্ম কিম্বা ফোনে,  
খাঁচায় পোষা পাখিরাও আছে, হয়  
তাদেরও বোধহয় অ্যালার্মে ঘুম ভাঙে।  
আকাশ এখানে বহুতলের ফাঁকে  
তেকোণা, চৌকো জ্যামিতিক ছবি আঁকে,  
গোধুলী কিম্বা উষার আলোর বেলা  
এ আকাশ পটে করে না রঙের খেলা।  
দিন-রাত্রির ফারাক বোঝা ভার  
রাত্রি এখানে নয়তো অন্ধকার,  
চাঁদ তারাদের লাগে বড়ই ফিকে  
এ শহর ফিরে চায় না তাদের দিকে।  
ব্যস্ত ভীষণ ব্যস্ত সদাই কাজে  
দিবারাত্রি কেবল ঘন্টা বাজে,  
ঘড়ির কাঁটায় বাঁধা পড়ে এ জীবন  
অবকাশ চায় ক্লান্ত শরীর মন।  
তবুও এ শহর আমায় রেখেছে সুখে  
এ শহর দেয় বাঁচার স্বপ্ন বুকে,  
ভিজে মাটির গন্ধ ভরা সুখ  
শিশির ভেজা সকাল নিয়ে আসুক।।

# অনেক কিছু মध्ये

- শঙ্কর বসু

শরীরের খামে ডাকটিকিট পড়ে গেছে  
এই মহানগরীর ঠিকানায়  
রোজ জমা করা খবরের শব  
ঘুমের অন্ধকারেও মুখোমুখি আমরা-ওরা।  
সামনের খোলা পথ হঠাৎই শেষ, কথা বাকী রেখে  
ক্রমাগত উতরাই এর দিকে  
দু একটা চড়াই দূরে মাথা তুলে  
খুঁজে নেওয়া রাস্তার আসেপাশে।

একদিন-

সেবার দার্জিলিংএ নিস্তরঙ্গ হরতাল  
মাঘী পূর্ণিমার রাত নিংড়ে আলো ফুটছে  
ধাতব শীতল ধোঁওয়া-ধোঁওয়া সময়  
কাঞ্চনজঙ্ঘার সিঁথি হলুদ আলোয় ধোওয়া...  
নড়ে চড়ে বসে শরীরে  
একটা বিমধরা ভালোলাগা ভাব।

আরও একদিন-

সিমুলতলার খবরহীন গ্রামে পড়ন্ত বিকেল  
কালো মেয়ের নিপুণ হাতে নিকনো উদাসী উঠোন  
কুরচি ফুলের টুপটাপ বোরে পড়া দুষ্টুমি...  
জমে থাকা কথা বাষ্প হয়  
মামুলি সময়ের বন্ধনীতে  
স্নিগ্ধ হয় প্রশান্ত-প্রবাস।

সব কিছু ভাবনায় ঢুকে পড়ে  
ঘুমধরা চোখের পাতায় ভেসে  
ভিড় করে আসে  
চৈত্রের উতল বাতাসে যখন মাতাল হয় রাত  
আমের বউলের গন্ধে  
দিনকাবারি নিঃশব্দে চলকে ওঠা মুহূর্ত  
যা কিছু শোভন, যা কিছু সুন্দর  
সবেতেই সে- একটা জাপান  
অনেক কিছু মध्ये।



# গ্রীষ্মের দাপটে

- রাজকুমার পাল

ঋতু রঙ্গময়ী রূপসী বাংলায়  
আসে প্রথম ঋতু-নায়ক ছন্দ-সুধমায়।  
দীপ্তচক্ষু তপঃ ক্লিষ্ট শীর্ণ সন্ন্যাসী রূপ,  
ধুলায় ধূসর রুম্ম পিঙ্গল জটাজাল স্বরূপ।  
শুষ্কজল নদীতীর তৃষ্ণার্ত প্রান্তরে  
গ্রীষ্মদেব শুষ্করুম্ম তৃণাসনে বসি ধ্যান করে।  
নির্মম নির্দয় চিত্তে সূর্য হস্তে ধরে  
নিষ্ফেপিল অগ্নিবাণ ধরণীবক্ষ পরে।  
সে আঘাতে ধরনীর মৃত্তিকা হৈল চৌচির  
নিশীথে নিদ্রারত জীব দাবদাহে অস্থির।  
অগ্নিমান্নে ধরিত্রী হল শুচিস্মিতা  
স্তম্ভ হয় বিহঙ্গকুজন, শ্যামলিমা অপহৃত।  
রক্ত-রাগে প্রদীপ্ত গগন মন্ডল  
আলোক বন্যায় পরিপ্লাত হয় সর্বতল।  
নেত্র-বহ্নি তপ্ত-নিঃশ্বাসে দন্ধ পুরাতন  
রিক্ত হয় ধরাভাঙে শস্যরতন।  
অগ্নিবাণে ভস্মীভূত ধূ ধূ প্রান্তর  
পত্রহীন তরুরাজি মরু নির্ঝর।  
বৈশাখী সন্ধ্যায় শুনি ঝঞ্ঝা দামামা আর  
বেজে ওঠে প্রলয় শঙ্খ পিনাকে টঙ্কার।  
মহাদেবের প্রলয়-নৃত্য তপস্যা আগুন-জ্বালা  
নিবৃত্তি মার্গের সাধনা সাবিত্রী মন্ত্র জপমালা।  
চাতকপাখি কাতরসুরে করে আওয়াজ  
'বউ কথা কও ' পাখি কয় চোখ গেল আজ।  
রোদে-পোড়া মেঠো চাষীর হৃদয়-তানপুরা শুনি  
বেজে ওঠে যার মাঝে আকুল সুরধ্বনি।  
টোকা মাথায় শীর্ণ চাষী মাঠে করে কাজ  
শ্রান্তপথিক তরুতলে বিশ্রামে বিরাজ।  
আম্র-কাননে মুকুল পরাগে শুভ পরিণয়  
স্নিগ্ধমধুর ফলরাশি ভরে রসময়।

# ব্যর্থ কবিতার দীর্ঘনিশ্বাস

- কৌশিক ভট্টাচার্য্য

কয়েক হাজার কবিতা লিখেছিলো সে,  
কেউ শোনে নি।  
স্বপ্ন দেখেছিলো সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে  
তার কবিতা,  
কেউ পড়ে নি।

স্বপ্ন মরে গেল তার, নিজেও সে মরে গেল  
পরে।

না-ছাপা কবিতা যত বিকোলো তা,  
কেজিতে দু-চার টাকা দরে।

হাওয়া হয়ে গেল তার কবিতা।  
এক দীর্ঘনিশ্বাস হয়ে  
সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়লো তারা।

যেমন সে স্বপ্নে দেখেছিলো।।